KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : পত্রিকা	Size : 6"x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/7 1/8-10 1/11 1/12	Year of Publication : ফাল্গুন, ১৩৮৬ চৈত্র- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬-৮৭ আষাঢ়, ১৩৮৭ শ্রাবণ, ১৩৮৭ Condition : Brittle / Good
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী	Remarks : VOL & NO. 1/7 ফাল্গুন, ১৩৮৬ 333 - 340 Page Missing

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম বর্ষ | পত্রিকা | চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ
৮ম—১০ম সংখ্যা | সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র | ১৩৪৬—'৪৭

আধুনিকতা ও বৈরাগ্যবাদ

নিশাপতি ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষের ইতিহাস নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। রাজন্যের দিগ্বিজয় বার বার অন্তর্প্রলয় সূচনা করেছে—বাইরে থেকেও উপর্য্যুপরি নানা পরাক্রান্ত জাতি এসে ভারতের বুকের উপর শ্মশান রচনা করেছে। এই অনিবার্য্য বিপ্লবগুলি ভারতের চিত্তকে বহুবার অন্তর্মুখীন করেছে। তার ফলে এদেশে জন্মলাভ করেছে মায়াবাদ, নিষ্কামবাদ, বৈরাগ্যবাদ ও সন্ন্যাসবাদ। এসব এক গাছেরই ফল!

অপরদিকে ইউরোপেও খ্রীষ্টীয় আত্মসমর্পন-তত্ত্ব এক গাল আহত হ'লে দ্বিতীয় গাল এগিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে—দাসত্বের ললাটে টীকা দেওয়ার জন্যে নয়, দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য ও সুখের প্রতি নিস্পৃহ ভাব দেখাতে। এ ভাব খ্রীষ্ট দেখিয়েছেন ক্রসের উপর এবং খ্রীষ্টের প্রাথমিক অনুচরগণও দেখিয়েছে Catacombs-এ বাস করে' বহু অত্যাচার ও নিগ্রহ ভোগ করে'। তাতে করে' খ্রীষ্টানদের ভিতর বৈরাগ্যবাদকে একটা উচ্চ মঞ্চ দিতে হয়েছে। খ্রীষ্টীয় Monk ও Nunরা সন্ন্যাসীর দল ছাড়া আর কিছু নয়। এ সব ছাড়া আরও একটি কারণ এই ধর্ম্মের বিধানে ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম নেতিমূলক বা Negative. এ ধর্ম্ম বৈপরীত্য বা antithesis-এর ভিতর দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করে। Spirit বা আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করে Matter-এর প্রতিবাদ রূপে। Bible-এ এজন্য আছে, 'Spirit is life, Flesh is death.' কাজেই আধ্যাত্মিকতার চর্চ্চা করতে ইন্দ্রিয়কে মৃত্যু বা পাপের আসন বল্‌তে হয়েছে। তাই রূপ রসকে বর্জ্জন করাই ধর্ম্মচর্চ্চাস্থানীয় হয়েছে। এজন্য প্রাথমিক খ্রীষ্টধর্ম্মের মূর্ত্তিগুলি বিষণ্ণ, জীর্ণ ও কুৎসিত করা হয় যাতে করে' ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ তা'তে না থাকে।

ভারতবর্ষে পুরুষ ও প্রকৃতি কল্পনায় পুরুষকে করা হয়েছিল নির্ব্বিকার ও নিষ্কর্ম্মা। এই কল্পনা হ'তে যোগের কল্পনা হয়। যোগ হচ্ছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ। যেদিন বুদ্ধ গৃহত্যাগ করে' ভিক্ষু হলেন সেদিন ভারতে নেতিমূলক মনোবৃত্তির সূচনা হয় একটা বিরাট পটভূমির উপর। বুদ্ধ মৃত্যু, জরা শোক প্রভৃতির অতীত পীঠে যাওয়ার সাধনা করে' পথের সন্ধান পেয়েছেন ভিতরের বোধিতে, বাইরের বিশ্ববিজয়ে নয়। ফলে যেতে হয়েছে নির্ব্বাণের চরম নেতিবাদে। জরা, মৃত্যু ও শোকাদির হলাহলকে আর কোনরকমে আয়ত্ত করতে পারেন নি।

সন্ন্যাসবাদ বৌদ্ধবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র এসিয়ায় বিস্তৃত হয়। ক্রমশঃ তার উৎকট চরম মাত্রা বর্দ্ধিত হয়ে তা' প্রবেশ করে সামাজিক ব্যবহার-বিধানে ও বহু তত্ত্বের সূক্ষ্ম অন্তরালে। এ সব তত্ত্ব ও আচার বৈরাগ্যের শিরে জয়মুকুট অর্পণ করেছে এবং অনাসক্ত ও নিষ্কাম হওয়াকে বাহবা দিয়েছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী ভারতের সমগ্র চিন্তাধারায় প্রকট ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ ও নিষ্কামবাদ কাজ করেছে।

জগৎ মিথ্যা বা মায়া—সত্য বোধিলাভে জগতের দুঃখ দূর হবে, এ-রকমের চিন্তাকে অদ্বৈতবাদ ঘনিয়ে তোলে। এ কথা অস্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন যে, হিন্দুর ষড়দর্শন আত্যন্তিক দুঃখবাদের উপর নিহিত—এজন্য এ দুঃখের অবসান করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়েছিল। সত্যিকার দুঃখদূরের চেষ্টা করে' সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জগতে ভারতবর্ষ বার বার ব্যর্থ হয়। শক হুন্ মোগল পাঠানেরা ভারতের বুককে প্রতিযুগেই রক্তাক্ত করে' তোলে—কাজেই দুঃখবোধকেই দূর করা প্রয়োজনীয় হয়েছিল, না হ'লে শাস্ত্র হয়ে যাচ্ছিল মিথ্যা। এজন্য গীতা সকলকে উপদেশ দিয়েছে :

"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" অগ্রসর হ'তে হবে। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয় একভাবে নিতে পারলে আর দুঃখ হয় না। সুখ ও দুঃখ যদি সমানই হয়—তবে সুখই থাকল কোথা? আঁধার না হ'লে আলোর জ্ঞান হয় না। এই যে পরস্পর-সাপেক্ষ (Relative) জ্ঞান তাকে অস্বীকার করলে শান্তি হয়ত পাওয়া যায়—কিন্তু সেটা কি বাস্তবতাকে স্বীকার করা হ'ল? সেটা হ'ল হঠযোগীর যাদুর মত—তাতে প্রত্যক্ষ জগতের ধর্ম্মের উপরই যবনিকা পতন হ'ল। আমি চোখ হারালে দুনিয়া অন্ধকার হয় না, আমিই অন্ধ হই—এ-কথাটি এমন কিছু দুরূহ প্রস্তাব নয়। কাজেই গীতাকারের এই ব্যবস্থা একান্তভাবে জ্ঞানের বিধিকে (dialectics) স্বীকার করছে না। Thesis, Antithesis ও Synthesis-এর (বাদ, প্রতিবাদ ও সংবাদ) ক্রম যেখানে নেই সেখানে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা অনুভূতি সম্ভব হয় না। কাজেই সমস্যার সমাধান এতে হ'ল না—সমস্যাকে অস্বীকারই করা হল।

এতে পূর্ব্বতন বৌদ্ধ ব্যবস্থার ধারাই চলছে বলতে হবে। বুদ্ধ ত্যাগ ও বৈরাগ্যবাদের এই Prescription দিয়েছিলেন :

"মুঞ্চপুরে মুঞ্চপচ্ছতো মজ্ঝে মুঞ্চ ভবসন পারগূ
সব্বথ বিমুত্ত মানসো ন পুন জাতি জর উপেহসি।"

সামনে, পেছনে বা মধ্যে যা' কিছু আছে সব ত্যাগ করে' পরপারে চলে' যাও—এরূপ সবদিকে বিমুক্ত হ'লে জন্ম ও জরা ভোগ করতে হবে না। এতেই সূত্রপাত হয় সব ত্যাগ করে' পরিস্ফুট ভিক্ষাবৃত্তির। তা'তে করে' জগতের রথচক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হওয়ার অধিকার ভারতবর্ষ অর্জ্জন করতে সুরু করে। দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী ভিক্ষুর সংখ্যা এমনি করে' বেড়ে যায়। এরা হয়ে গেল সব দায়িত্ববর্জ্জিত, কর্ম্মহীন ত্যাগী। এটা বলতে গেলে সংসারের একটা antithesis বা প্রতিবাদ মাত্র। প্রতিবাদে সমস্যা পূরণ হয় না—আরও ধূমায়িত হয়।

পরবর্ত্তী যুগে শঙ্কর প্রভৃতি আরও সূক্ষ্মভাবে আর একটি নূতন শাণিত ছুরিকা প্রয়োগ করেছেন

সমাজের ভিতর—ত্যাগের হাওয়া বিস্তার করতে। বাইরের শত্রুর আক্রমন অপেক্ষা ভিতরের এই তাত্ত্বিক আবহাওয়া ভারতের মাংসপেশীকে শিথিল করেছে অধিক। গীতার কর্ম্মবাদ একটা অলীক abstraction-এর উপর নিহিত—গীতাকার কর্ম্মবাদের ফরমায়েস করতে গিয়ে রক্তচক্ষু ভারতীয় শাস্ত্রশাসনের খাতিরে তার সঙ্গে "নিষ্কাম" কথাটি যোগ করে' দিয়েছেন। সোনার পাথর-বাটি বরং সম্ভব হয়, নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভব হয় না। শুধু কোন বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রের পক্ষেই নিষ্কাম হওয়া সম্ভব।

গীতায় কর্ম্মের দুটি দিকের উপর আলোকপাত করেছে :

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫।২

কর্ম্মযোগের ভিতর নিষ্কামতা পুত্তলিকার পক্ষেই সম্ভব। এরূপ ব্যবস্থার মানে কি? পাছে কর্ম্মে ব্যর্থ হ'লে দুঃখ উপস্থিত হয় তাই গোড়াতেই তার শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিকড় কেটে দিতে গিয়ে গাছটাই যে কেটে গেছে এটা লক্ষ্য করা হয়নি। বস্তুতঃ, এই দুঃখভীতিই বা কেন? এমনি করে' ভারতের চিত্ত ভীরু হয়ে গেল কেন? তত্ত্বের দিক হ'তে, ফুল চয়ন করতে গেলে কাঁটার আঘাত সইতেই হবে। দুঃখের জ্ঞান যতটা উগ্র হবে সুখের অনুভূতিও তেমনি প্রখর হবে। দুঃখ না থাকলে সুখও অন্তর্হিত হবে। এ দুটি জিনিষ একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ। কাজেই যারা সুখের ফসল চায় তাদের দুঃখের বীজ বপন করতে হবে। দুঃখকে অস্বীকার করে' বা দুঃখ হ'তে দূরে পালিয়ে সুখের খোঁজ মিলবে না।

কাজেই সংসার বর্জ্জনের মূলে আছে বিভীষিকা। বৈরাগ্যশতকের প্রতি শ্লোক প্রমাণ করেছে : "বৈরাগ্যমেবাভয়ং"। অর্থাৎ ধন থাকে ত ডাকাতে কেড়ে নিতে পারে, মোহমুদ্গরের মতে ছেলেরাও ধনী পিতাকে নিহত করতে পারে—এজন্য ধন মান সব ত্যাগ করলে আর কোন ভয় থাকে না। কাজেই যারা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘোরে তাদের কোন ভয় নেই। ভারতবর্ষকে এমনি সাধুই সাজতে হয়েছে।

কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে দুঃখের আঘাতকে বরণ করে' অগ্রসর হওয়ার যাদুমন্ত্র হ'তে ভারত বহুকাল বঞ্চিত হয়েছে। এবং তা'তে একটা পঙ্কিল অবাস্তব কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। "কাঞ্চনকে ত্যাগ কর"—এ উপদেশের মূলে কি আছে তা মায়াবাদী বা বিরাগবাদীরা লক্ষ্য করে নি। কাঞ্চন একটি রূপবিশ্ব মাত্র নয়—তা' শক্তিরই প্রতীক। কাঞ্চনের সাহায্যে জাতির প্রতিষ্ঠা ও গৌরব সিদ্ধ হয়—তা' সকল আশ্রমের কল্যাণ সাধন করে ; এ জিনিষ ত্যাগ করতে হবে? সেকালে "কামিনী"ও একটি Property স্থানীয় ছিল, কাজেই তাকেও বর্জ্জন করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে। এমনি করে' মায়াবাদীর Ordinance এদের intern বা extern করতে আদেশ দিয়েছে।

বস্তুতঃ এই অপ্রচুর পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব সমগ্র ভারতকে যুগযুগান্ত পর্য্যন্ত ভীরু, দুর্ব্বল ও আত্মঘাতী করেছে। এজন্য ভোগ ও বাস্তববাদী জাতি সমূহের শক্তিমান স্পর্শেই ভারতের তৈরী এই কাচের যাদুঘর বার বার চূর্ণিত হয়েছে! বিস্ময়ের বিষয়, আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা আবার সন্ন্যাস-

ধর্ম্মের পালে হাওয়া ছোটাতে আরম্ভ করেছে। ইংরাজের প্রবল বাস্তববাদ, এবং দুঃখ ও যন্ত্রণাবরণের অপরিসীম পটুতা ইংরাজকে ভারতের একাধিপত্য দান করেছে। এর ফলে চারিদিকে আশ্রম ও মঠ স্থাপিত হয়েছে—আলস্যের এই সব দুর্গের সাহায্যে প্রতীচ্য সভ্যতাকে হটিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র এ সবের ভিতরে চল্‌ছে। বৈরাগ্যের রণ-দামামা শক্তির জয়পতাকাকে মলিন করতে উৎসাহিত হয়েছে! ভারতের ইতিহাস আবার নিজকে পৌনঃপুনিকতার তালে নিয়ে যাচ্ছে।

তিব্বতের ইতিহাসে এভাবে একবার বহুলক্ষ যুবক মঠে ঢুকে পীর হ'তে উৎসাহিত হয়। ফলে তিব্বতের সম্রাট আইন করে' এদের গেরুয়া অবগুণ্ঠন ছিনিয়ে নিয়ে সোজাসুজি সৈনিকের শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে' দেন। তিব্বতের এ সম্রাট ছিলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক। তন্ত্রবাদ এ সব ন্যাকামি ও দুর্ব্বলতাকে কখনও উৎসাহ দেয় নি। বস্তুতঃ এসিয়ার নব জাগরণ হয় তন্ত্রবাদের বাস্তবপন্থী তত্ত্বের সাহায্যে।

তন্ত্র শক্তিবাদের ভিতর দিয়ে বর্জ্জনবাদ ও পলায়নপন্থার প্রতিবাদ করে। চণ্ডীতে যে প্রার্থনা আছে "রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি" তা'তে গীতার ভীরুতা নেই এবং মায়াবাদীর কষ্টকল্পনা নেই। তা'তে আছে তন্ত্রের শাণিত বাস্তব বোধ। কুলার্ণব তন্ত্র তাই বলেছে, যোগই ভোগ হয়ে যায় এবং সংসারই মোক্ষ হয়। পলায়ণের গুপ্ত পরামর্শে পরিত্রাণ নেই—সংসারের সম্মুখীন হওয়াই মুক্তির পথ। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগে জীবনের সিংহদ্বার খোলেনা—এদের ভাগবতী শক্তির আধার বলে' বরণ করে' নিলেই সে-সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়। এজন্য বুকের পাটা শক্ত হওয়া চাই। শক্তি নিয়ে ক্রীড়া করতে হ'লে সাধককে ভীরুতা ত্যাগ করতে হবে।

এই বর্জ্জন-বিধি ও সমর্পণতত্ত্ব (surrender) যে ঐক্য সৃষ্টি করে তা'তে শক্তিকে অস্বীকার করতে হয়। পদ্মপত্রে যেরূপ জল থাকে সেরূপ পৃথিবীতে মানুষকে থাকতে হবে—গীতার এই উপদেশেও নিজেদের দৃঢ়তার উপর আস্থার অভাব দেখা যায়। আসক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা প্রশস্ত তুরীয় বিধির অনুমত নয়। তুরীয় স্তরে যে আকর্ষণ—স্থূলেও তাই; এই আকর্ষণ একটা সার্ব্বভৌম বিধান। অণুপরমাণু এই আকর্ষণের সাহায্যেই বিধৃত। একে অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করলে জ্ঞানের মর্য্যাদা বাড়ে না। এজন্য তন্ত্র দেবীকে শক্তি কল্পনা করে' দৈবকে করেছে তার আধার; এবং এই উভয়কে অর্দ্ধনারীশ্বর কল্পনা করে' নারীভীতি দূর করেছে। এই তত্ত্বের দিক হ'তে নারীত্ব একটা প্রতিপক্ষ নয়, এর সঙ্গে বিরোধ করা বা একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়; নরত্বও এই কল্পনার অঙ্গীভূত।

বিস্ময়ের বিষয়, আধুনিক যন্ত্রযুগেও সন্ন্যাসবাদ ও সন্ন্যাসী সাজা সম্ভব হচ্ছে। তাই গেরুয়া হচ্ছে কিংখাবের মত গর্ব্বের বস্ত্র। কৌপীন হয়েছে মস্‌লিন অপেক্ষাও মহামূল্য। সমগ্র ভারত এই সন্ন্যাসবাদে কবলিত হয়ে পড়েছে, তবুও ধ্বনি হচ্ছে "তারা আস্‌ছে।" তান্ত্রিক পাল সাম্রাজ্য ভারতের শিরে শেষ মুকুট পরিয়েছিল—তান্ত্রিক জাপান আজও সেই বাণীতে শক্তিমান। চীনের বৈরাগ্যবাদ সমানতাল রক্ষা করেছে ভারতের অনাসক্তিবাদের সঙ্গে। দুটি জাতির অবস্থাই আজ প্রায় একরকম। চীনের গৃধ্রকূট পর্ব্বতশিরে (vulture peak) এখনও বৌদ্ধভিক্ষুগণ ঘণ্টাধ্বনি করছেন। ভারতের নব্যতম মঠও ত্যাগের দোহাই দিয়ে

ত্রিতল অট্টালিকা অপেক্ষাও বৃহত্তর সৌধ রচনা করছে! এসব মঠের ভিতর প্রাচীন মায়াবাদ ও সন্ন্যাসবাদের যাদু বহু সহস্র যুবককে অন্তরীণ করে' রেখেছে। এদের উদ্ধারে Habias Corpus Act কার্য্যকরী হবে না। অগণ্য অর্থের মালিকও আজ কোন কোন স্থানে কুটির তৈরী করে' বৈরাগ্যের ভড়ং করছে। এ অবস্থায় সময়োপযোগী তত্ত্বও কেউ উপস্থিত করতে সাহস করছেনা, কেবলই বৈরাগ্যশতকের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে—বৈরাগ্যমেবাভয়ং। এরই antithesis স্বরূপ প্রকটিত হচ্ছে অন্ধ ব্যক্তিস্বার্থবাদ দিকে দিকে যা বিরাট জাতির ভিতর রক্তসঞ্চালনে বাধাদান করে' একটা শীর্ণতা উপস্থিত করছে।

ইউরোপ ও এসিয়ার তত্ত্বগত এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার বিষয়। হিটলার জাতিকে শক্তিমান করতে mass marriage-এর সূচনা করেছেন—এদেশ mass ধ্যানীবুদ্ধ সংগ্রহ করে' কৌপীনবাদের মহিমা বাড়াচ্ছে। নব্য সামাজিক বাস্তবতার দিক হ'তে নির্ম্মমভাবে কি এসব কল্পনার জাপানী ফানুস উড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন নয়? রূপ রস গন্ধের বাস্তবতার উপর চিত্তের মর্ম্মরভিত্তি স্থাপন করতে হবে—অলীকতার বুদ্‌বুদ সংগ্রহের উপর নয়। ভারত জগৎকর্ত্তৃক বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়েও নিজের মর্য্যাদা লাভের পথ খুঁজে পায় নি। জগতে ধ্যানীবুদ্ধের যুগ এটি নয়। আধুনিকতা নূতন আবষ্টনে আয়ুধে এযুগে উপস্থিত হয়েছে—তা সন্ন্যাসবাদের কুহেলিকে চুঙ্-লিঙ-সঙের বাক্সে পূরে রেখে দিয়েছে। নূতন বেদের সামরব ধ্বনিত হচ্ছে, দেশ কালের দূরত্ব উড়ে গেছে! সমগ্র পৃথিবীর মানব পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে। এর ভিতর চালাকি করে' তাক লাগিয়ে কোন জয়লাভ সম্ভব হবে না। 'ভিক্ষার ঝুলি হাতে মানুষ'—এ রকমের চিত্র যাদুঘরে রক্ষিত হবে। তন্ত্রের যে-বাণী একসময় প্রচার করে যে কলিযুগে শ্রৌতপন্থা চল্‌বে না—সে-বাণী আকার নিয়ে আস্‌ছে নব্য ভাবের কুরুক্ষেত্রে। তা'তে সংসারকে অস্বীকার করার বিলাসিতার স্থান নেই। আধ্যাত্মিক ভাবচর্চ্চার নিরাপদ কুসুমশয়ন ও চামরব্যজনের অভিনয় এর সঙ্গে খাপ খাবে না। হিমালয়ের গুহা খোলাই থাকবে বর্জ্জিত ও পতিতের জন্য—কিন্তু আলাদিনের গুহাদ্বার উন্মোচিত হবে না যন্ত্রদৈত্যের পরাক্রম ছাড়া। বর্ত্তমান শক্তিবাদ এই সত্যকেই উদ্ঘাটিত করছে।

ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা

সুধাংশু দাশগুপ্ত

হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টিভঙ্গী মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ বস্তুবাদের মধ্যে এনে তাকে নূতন রূপ দিয়েছিলেন। তাঁদের আগে বস্তুবাদ ছিল যান্ত্রিক বা মেকানিক্যাল। বস্তুবাদের এই নূতন রূপই মার্কস্‌দর্শনের গোড়ার কথা। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা ডায়ালেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম্ মার্কস্-বাদের প্রাণবস্তু। অক্লান্ত পরিশ্রম করে' মার্কস্ ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস্ প্রকৃতি, ইতিহাস ও চিন্তাধারা—এই তিন ক্ষেত্রেই ডায়ালেক্‌টিক-গতির অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। ইতিহাস চর্চ্চা শুধু সন্ তারিখ, রাজা-মহারাজার যুদ্ধ-কাহিনীর বিবৃতি নয়—ইতিহাসের একটা অলঙ্ঘ্য গতিধারা আছে, তার সন্ধানই ইতিহাস চর্চ্চার মূল কথা।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বুর্জোয়া ঐতিহাসিকগণও ইতিহাসের গতিধারার সন্ধান করে' থাকেন কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে তাঁরা মার্কস্‌বাদকে এড়িয়ে চলেন, এবং ফলে ইতিহাসের ধারা নির্ণয়ে তাঁরা হ'ন অপারগ। ইতিহাসের প্রকৃত ধারা নির্ণয় করতে হ'লে মার্কসবাদ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কারণ মার্কস্ তাঁর ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ইতিহাসের প্রকৃত ধারা নির্ণয় করে' গিয়েছেন—ইতিহাস চর্চ্চায় মার্কসের এই দৃষ্টিভঙ্গী ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা নামে খ্যাত।

সমাজের প্রত্যেক জিনিষই ক্রম-বিবর্ত্তনের নিয়মাধীন। বিশ্বসংসারের কোন কিছুরই চিরস্থিরতা নেই—মানুষের সকল বিধি-ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান এমন কি আইডিয়ার ক্ষেত্রেও একটা গতি লক্ষিত হয়। এই গতি সমস্ত পরিবর্ত্তনের মূল। পরিবর্ত্তনের বীজ বস্তুর মধ্যে লুক্কায়িত —বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত পরস্পর-বিরোধী শক্তির সংঘর্ষের ফলেই পরিবর্ত্তন। প্রত্যেক বস্তুর তার নিজস্ব গড়ন-অনুযায়ী একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। তাই বিবর্ত্তন আকস্মিক ও লক্ষ্যহীন নয়। "বিবর্ত্তন প্রণালীর ধাঁচ হচ্ছে বস্তু বিশেষের অবস্থান (থিসিস), অন্তর্নিহিত বিরোধীশক্তির সংঘাত (অ্যান্টীথিসিস), তারপর সামঞ্জস্য (সিনথিসিস); সেই সময় থেকে আবার নতুন পরিবর্ত্তন-ধারার সূত্রপাত। একই সময়ে পরস্পর-বিরোধী শক্তির পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একত্র অবস্থান সম্ভব, কিন্তু পরিণামে ভারসাম্য ভেঙে পড়তে বাধ্য, তাই বিরোধই হচ্ছে সামঞ্জস্যে অগ্রসর হবার উপায়—সেজন্য শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এভাবে শ্রেণীভেদের অবসান হওয়াই সম্ভব। পরিবর্ত্তনের এই ধারা অনেকটা কম্‌রেখা বা স্পাইরালের মতন, বৃত্তাকার কিম্বা সরল রেখা নয়; অর্থাৎ বিবর্ত্তনের প্রতি পদেই উন্নতির সোপান অধিরোহন হয় না, অথচ সিন্‌থিসিসের সময় আমরা ঠিক গোড়ার অবস্থায় ফিরে যাই না। গতির বেগ অবশ্য কখনও দ্রুত, কখনও বা মৃদুমন্দ; পরিবর্ত্তন কিন্তু অবিচ্ছিন্ন স্রোত নয়, স্তর থেকে স্তরান্তরে যাওয়াতে উল্লম্ফন থাকে, সিন্‌থিসিসের মধ্যে নতুন কোন বিশিষ্ট গুণ বা কোয়ালিটি দেখা যায়—আর এই বিপ্লব ইতিহাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ"—(সুশোভন

সরকার—মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ)—ইতিহাসের এই বিপ্লবাত্মক ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োগে ইতিহাসের ধারা ও অগ্রগতির কারণ নির্ণয় সম্ভব। অপরিবর্ত্তনীয় সমাজ-ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণের শাশ্বত সনাতন অনুশাসন, জমিদারের খপ্পরে কৃষকের, ধনিকের কবলে শ্রমিকের যুগ যুগ ধরে' দুর্গতি, পীড়নের 'চিরন্তন ধারণা' শুধু অস্বাভাবিক নয়, অর্থহীনও। ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস-স্তূপের ভিতর দিয়েই ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যুত্থান, আবার ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙ্গনের মধ্য দিয়েই সোস্যালিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার আগমন। ভারতের কুটীরশিল্প, গ্রামের পঞ্চায়েৎ একদিন ছিল বিশ্বের আকর্ষণীয়—আজ যন্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে তা লুপ্তপ্রায়। বিজ্ঞজনেরা এর জন্য হা-হুতাশ করে' থাকেন, কিন্তু হা-হুতাশে ইতিহাসের গতিরুদ্ধ করা অসম্ভব। বহিঃশত্রুর আক্রমন, অন্তর্বিরোধ, এক একটি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, দুর্ভিক্ষ মহামারী কিছুই ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে বিকল করতে পারে নি, কিন্তু য়ুরোপীয় বণিকের আগমনই ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করল, সমাজে এক বিপ্লব সুরু হোল। সেই বিপ্লবের রেশ টেনে আজ ভারত এগিয়ে চলছে এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার দিকে। কিন্তু এই যে বিপ্লব, এই যে পরিবর্ত্তন —এর উৎস কোথায়? সে-উৎসের সন্ধান শুধু মার্কস-বিজ্ঞান দিতে পারে এবং তা ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যায় নিহিত।

বিদেহী চৈতন্যের আগে জড়বস্তুর অস্তিত্ব, পরম মনের আইডিয়ার ক্রমবিকাশের পরিবর্ত্তে প্রকৃত বস্তুর বিবর্ত্তনে বিশ্বাস হ'চ্ছে মার্কসদর্শনের গোড়ার কথা। জীবের মানসিক ক্রিয়াকে মার্কস্ অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন যে বস্তুটা মুখ্য, মনটা গৌণ—বস্তুর বিবর্ত্তনেই মনের আবির্ভাব, আবার এ দু'য়ের সংঘর্ষের ফলেই বস্তুর ক্রমবিকাশ। জড় জগতের উদ্ভব মানুষের মানসিক জগত থেকে নয়—জড় জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং মানুষের মন এই জড় জগতেরই প্রতিফলন। এর থেকে এটা প্রতীয়মান যে সমাজের বাস্তব জীবনটাই মুখ্য, আধ্যাত্মিক জীবনটা গৌণ এবং ওর উদ্ভবও ঐ বাস্তব জীবন থেকে, তা আমরা যতই বেদমাহাত্ম্য প্রচার করি না কেন। মানুষের প্রত্যয়ের বাইরে সমাজের বাস্তব জীবনের একটা নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন বাস্তব জীবনেরই প্রতিফলন।

সুতরাং সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনের উৎস ও সামাজিক ধারণা-সমষ্টি, বিধি-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উৎপত্তির সন্ধান মানুষের আদর্শ, চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর মিলবে না—ওর সন্ধান মিলবে সমাজের তৎকালীন বাস্তব জীবনের অবস্থার ভিতর। কারণ সমাজের ধারণা-সমষ্টি, বিধি-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিই সমাজের বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। তাই ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সামাজিক ধারণা-সমষ্টি, বিধি-ব্যবস্থা, চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মানব সমাজে যখন দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল তখন সমাজের ধারণা-সমষ্টি, চিন্তাধারা, বিধি-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল এক ধাঁচের, কিন্তু ফিউডাল সমাজে সেগুলো গেল বদলে; আবার ধনতন্ত্রে আবির্ভাব হ'ল অন্য এক প্রকারের ধারণা-সমষ্টি, চিন্তাধারা, বিধি-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

প্রভৃতির। বিভিন্ন যুগে এন্নিতর সামাজিক প্রকার ভেদের বিশ্লেষণ যুগবিশেষের ধারণা-সমষ্টি, চিন্তাধারা, আদর্শ, বিধি-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও গুণাবলীর ব্যাখ্যায় সম্ভব নয়—এ শুধু সম্ভব যুগবিশেষে সমাজের বাস্তব জীবনের অবস্থার নিরূপণে। সমাজের বাস্তব জীবনের অবস্থানুসারে সমাজের ধারণা-সমষ্টি, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে' ওঠে—"মানুষের সংবিৎ বা চেতনা মানুষের সত্তা নির্ণয় করে না, বরং তাদের সামাজিক সত্তাই তাদের সংবিৎ বা চেতনা নির্দ্ধারণ করে।"

কিন্তু এ থেকে এটা মনে করবার কোন কারণ নেই যে সমাজ-জীবনে সামাজিক ভাবধারা, থিওরি, রাজনৈতিক ধারণা-সমষ্টি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ্যা, তাৎপর্য্যহীন—কারণ সমাজের বাস্তব জীবনের উন্নতির সোপান অধিরোহন ক্ষেত্রে এগুলির প্রভাব প্রচুর। ইতিহাসের একই যুগে বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক ভাবধারা, থিওরি দৃষ্ট হয়। একদিকে জরাজীর্ণ পুরাতন ভাবধারা ও থিওরি—সমাজ-জীবনে এদের কার্য্যকারিতা নিঃশেষিত এবং সমাজের ক্ষয়োন্মুখ শক্তির এরা পরিপোষক। এগুলির তাৎপর্য্য এই যে সমাজের অগ্রগতির এরা প্রতিবন্ধক। অন্যদিকে নতুন, প্রগতিশীল ভাবধারা ও থিওরি—এরা সমাজের অগ্রগামী শক্তির পরিপোষক। সমাজের প্রগতির পথ এরা প্রশস্ত করে' দেয় এবং সমাজের বাস্তব জীবনের সমৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এদের ভিতর দিয়েই যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সমাজের পুরাতন ভাবধারা, থিওরির পাশাপাশি নতুন ভাবধারা ও থিওরির আবির্ভাব হয় কখন? নতুন ভাবধারা ও থিওরির আবির্ভাব আকস্মিক কিছু নয়—সমাজের বাস্তব জীবনের অগ্রগতি যখন সমাজে নতুন নতুন কর্ত্তব্য নিয়ে আসে, তখন তারই সম্পাদনের জন্য নতুন ভাবধারা ও থিওরির আবির্ভাব। আবির্ভাবের পর এই নতুন ভাবধারা ও থিওরি প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে সমাজে কাজ করতে থাকে—সমাজের বাস্তব-জীবনের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে' দেওয়াই তাদের প্রধান কাজ। এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে নতুন ভাবধারা, নতুন থিওরি, নতুন রাজনৈতিক ধারণা-সমষ্টি, নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগঠন, সমাবেশ ও পরিবর্ত্তন করবার বিরাট শক্তির আত্মপ্রকাশ। সমাজ-জীবনে তারা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এদের সংগঠন, সমাবেশ ও পরিবর্ত্তন করবার বিরাট কর্ম্মশক্তি ব্যতীত সমাজের বাস্তব জীবনের পরিপুষ্টি সাধন অসম্ভব—তাই এদের আবির্ভাব। সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে' এই নব ভাবধারা ও থিওরি নিজেদের প্রসারের পথ প্রশস্ত করে' নেয়। ধীরে ধীরে এরা নিপীড়িত জনগণের সম্পদ হয়ে ওঠে এবং তাদের সমাজের তদানীন্তন জরাজীর্ণ ক্ষয়োন্মুখ শক্তির বিরুদ্ধে একজোট করে' তোলে। এন্নিভাবে এরা সমাজের বাস্তব-জীবনের বিকাশের প্রতিবন্ধক শক্তিগুলির ধ্বংস সাধনের সুব্যবস্থা করে' দেয়। আবার এই সব নব ভাবধারা ও থিওরি সমাজের বাস্তব-জীবনের উপর সঞ্চোরে প্রতিঘাত করে এবং ফলে বাস্তব জীবনের অগ্রগতির পথে অবশ্যকরণীয় কর্ম্মাবলীর সুচারু সম্পাদের অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন বাস্তব জীবনের উন্নতির সোপান হয় অর্গলমুক্ত।

সংক্ষেপে সমাজের বস্তুর সঙ্গে সমাজের চেতনার, সমাজের বাস্তব-জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বন্ধের এই প্রকৃত বিশ্লেষণ।

কিন্তু যে-জিনিষটী সমাজের চিন্তাধারা, ধারণা-সমষ্টি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নির্ণায়ক সেই বাস্তব-জীবনের অবস্থা বলতে কি বুঝায়? এবং তার প্রকৃত স্বরূপটা কি?

প্রকৃতি সমস্ত সমাজকে ঘিরে আছে, ভৌগলিক পরিবেষ্টন সমাজের বাস্তব-জীবনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ—সমাজের প্রগতির পথে এর প্রভাব প্রচুর; সমাজের অগ্রগতির এটী কখনও বা সহায়ক, কখনো বা প্রতিরোধক। কিন্তু সমাজ-জীবন, মানুষের সামাজিক ব্যবস্থার স্বরূপ এবং সমাজ-ব্যবস্থার স্তর থেকে স্তরান্তরে পরিবর্ত্তন নির্ণয়ে ভৌগলিক পরিবেষ্টন মুখ্য নয়। ভৌগলিক পরিবেষ্টনের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির তুলনায় সমাজ-জীবনের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির গতি অতিদ্রুত। তিন সহস্র বছরের মধ্যে য়ুরোপে পর্য্যায়ক্রমে তিনটী সমাজ-ব্যবস্থার—আদিম গোষ্ঠী প্রথা, দাসত্ব প্রথা এবং ফিউডাল তন্ত্র—উত্থান ও পতন দেখা যায়। আবার পূর্ব্ব য়ুরোপে চারটী সমাজ-ব্যবস্থার উত্থান ও পতনের পর আজ সোস্যালিজম সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে য়ুরোপের ভৌগলিক পরিবেষ্টনের প্রকৃত কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি বা যেটুকু হয়েছে তা দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত। এটা খুবই স্বাভাবিক। ভৌগলিক পরিবেষ্টনের পরিবর্ত্তন হ'তে কোটী-কোটী বছরের প্রয়োজন, কিন্তু মানব সমাজ-ব্যবস্থায় দুই সহস্র বছরের ভিতর যুগান্তর সম্ভব।—আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (খৃঃ পূঃ ৩২৭) তখন ভারতবর্ষের ভৌগলিক পরিবেষ্টন যেরূপ ছিল আজও প্রায় ঠিক সেরূপই আছে, কিন্তু এই দীর্ঘ দুই সহস্র বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার বিরাট আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। সুতরাং ভৌগলিক পরিবেষ্টনকে সমাজ-জীবনের প্রগতির কারণ নির্ণায়ক কল্পনা করা অবাস্তব। সহস্র সহস্র বছরের ভিতর যে-জিনিষটী প্রায় অপরিবর্ত্তনীয় রয়ে গিয়েছে, সেটী কি আর একটী জিনিষের—যার অল্প কয়েক শত বছরের মধ্যে বিপুল পরিবর্ত্তন হয়েছে—অগ্রসর্তির কারণ নির্দ্দেশ করতে পারে?

লোকবৃদ্ধি, অধিবাসীদের বসবাসের ঘনত্ব সমাজের বাস্তব জীবনের অন্তর্ভুক্ত। একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অধিবাসী না থাকলে সেদেশের সমাজের বাস্তব-জীবন অর্থহীন। সমাজের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে লোকবৃদ্ধির প্রভাব বিদ্যমান—কখনও বা অনুকূলে, কখনো বা প্রতিকূলে। কিন্তু ভৌগলিক পরিবেষ্টনের ন্যায় লোক বৃদ্ধিও মানব-সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ে মুখ্য কারণ নয়। দাসত্ব প্রথা, ফিউডাল সমাজ এবং তারপর ধনতন্ত্রের প্রথমে পুষ্টিসাধন ও পরে ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা—য়ুরোপে এই ক্রমবিকাশের ব্যতিক্রম হ'ল না কেন? কেন দাসত্ব প্রথার পরেই ধনতন্ত্রের আবির্ভাব সম্ভব হ'ল না? এ সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর লোকবৃদ্ধির মাপকাঠিতে অসম্ভব। লোকবৃদ্ধি যদি সমাজের শ্রীবৃদ্ধির প্রতিমান হয় তবে যে-দেশে বসতির হার উর্দ্ধে সে-দেশে উন্নত সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে।—ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বসতির ঘনত্ব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ছয়গুণ, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ-ব্যবস্থা ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক উন্নত স্তরে—ভূরতবর্ষের অনেক স্থানে আজও ফিউডাল তন্ত্র বিরাজমান, ভারতবর্ষে ধনতন্ত্র আজ বিকাশোন্মুখ, আমেরিকা কিন্তু অনেক পূর্ব্বেই ধনতন্ত্রের শীর্ষস্তরে পৌঁছে গিয়েছে, সেখানে ধনতন্ত্রের আজ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা। বেলজিয়ামের জনসংখ্যার বসতির হার আমেরিকার উনিশ গুণ, সোভিয়েট রাশিয়ার ছাব্বিশ গুণ,

অথচ সমাজের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমেরিকা বেলজিয়ামের অনেক উর্দ্ধে, আর সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বেলজিয়ামের কোন তুলনাই হয় না—বেলজিয়ামে এতদিন ধনতন্ত্রই বিরাজিত ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ায় সোস্যালিজম আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং লোকবৃদ্ধি সমাজ জীবনের প্রগতির প্রতিমান নয়।

তাহলে সমাজ-জীবনে বৈচিত্র্যলীলা, স্তর থেকে স্তরান্তরে সমাজের অগ্রগতির নির্ণায়ক বাস্তব জীবনের মূলসূত্রটী কী? মার্কস্‌বিবৃত বিজ্ঞানানুসারে মানুষের জীবিকা সংস্থানের পন্থা ও ধনোৎপাদন-পদ্ধতিই সেই মূলসূত্র। জীবনধারণের জন্য খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, বাসস্থান প্রভৃতি মানুষের একান্ত প্রয়োজন; এগুলি সংগ্রহের জন্য মানুষকে উৎপাদনের শরণাপন্ন হ'তে হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের আবার প্রয়োজন হয় উৎপাদন-যন্ত্রপাতি—তার উৎপাদনও মানুষের করতে হয় এবং এবং তার ব্যবহারও মানুষের শিখতে হয়।

এই উৎপাদন যন্ত্রপাতি যার সাহায্যে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হয়, এবং জনগণ যারা উৎপাদন-যন্ত্রপাতির পরিচালনায় ধনোৎপাদন করে—এই দুই নিয়েই সমাজের উৎপাদিকা শক্তি গঠিত।

কিন্তু এই উৎপাদিকা-শক্তি উৎপাদন-পদ্ধতির একটী দিক্ মাত্র—ধনোৎপাদনে ব্যবহৃত বস্তু ও প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের শুধু এ প্রকাশক। উৎপাদন-পদ্ধতির আর একটা দিক ধনোৎপাদনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ—অর্থাৎ উৎপাদন সম্বন্ধ। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজে তার বসবাস। জীবিকা সংস্থানের জন্য নিসর্গভাবে সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে না—ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর সমর্থনেই প্রকৃতির সঙ্গে তার সংগ্রাম। সুতরাং সব সময়েই ধনোৎপাদন সামাজিক পদ্ধতি বিশেষ। আবার ধনোৎপাদন ক্ষেত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন রকমের সম্বন্ধের আবির্ভাব,—এ-সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনশীল। অত্যাচার, শোষণের বহিষ্কৃত জনমানবের মধ্যে এ-সম্বন্ধ ছিলো সহযোগিতার সম্বন্ধ; ফিউডাল সমাজ ও ধনতন্ত্রে এ-সম্বন্ধ শোষক ও শোষিতের মধ্যে আধিপত্য ও আনুগত্যের পর্য্যায়ভুক্ত। এ-সম্বন্ধ সমাজে ভিন্ন-ভিন্ন স্তর অর্থাৎ শ্রেণীর রূপ নেয়। কিন্তু এ-সম্বন্ধের স্বরূপ যা-ই হোক্ না কেন, সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থায়ই ধনোৎপাদনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ উৎপাদিকা-শক্তির ন্যায় উৎপাদন পদ্ধতির একটী অঙ্গ। মার্কসের মতে ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষ শুধু প্রকৃতির উপরই আঘাত করে না, তাদের নিজেদের ভিতরও ঘাত-প্রতিঘাত বিদ্যমান; যুগবিশেষে একটী বিশিষ্ট পন্থায় সহযোগ ও নিজেদের কর্ম্মাবলীর বিনিময়ে তাদের ধনোৎপাদন। ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ভিতর একটা সম্বন্ধের সৃষ্টি হয় এবং সেই সামাজিক সম্বন্ধের গণ্ডীর মধ্যেই তাদের প্রকৃতির উপর সমস্ত কার্য্যকলাপ, তাদের ধনোৎপাদন ঘটে' থাকে।

সুতরাং উৎপাদিকা-শক্তি ও মানুষের উৎপাদন-সম্বন্ধ—এ দু'য়ের সংযোগে সমাজের ধনোৎপাদন-পদ্ধতি গঠিত।

ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে তিনটী বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে:

(১) উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্ত্তনশীল, অধিক কালের জন্য একই অবস্থায় অবস্থান এর পক্ষে অসম্ভব—নিয়তই এর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। উৎপাদন পদ্ধতির এই পরিবর্ত্তনের ফলে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক ধারণা-সমষ্টি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে—সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তখন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে আমরা মানুষের বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন-পদ্ধতি, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের বিভিন্ন পন্থা দেখতে পাই। আদিম গোষ্ঠী সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে দাসত্ব প্রথার উৎপাদন-পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্য ছিল না, আবার ফিউডাল তন্ত্রের উৎপাদন পদ্ধতি ও দাসত্বপ্রথার উৎপাদন-পদ্ধতির ভিতর পার্থক্য বিশাল ও দুস্তর। সমাজের প্রকৃতি ও গড়ন ক্ষেত্রেও ঐ তিনটী স্তরের সমাজ-ব্যবস্থা, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন, ধারণা-সমষ্টি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ তিনটি বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত। মোটকথা, যুগবিশেষে সে-যুগের উৎপাদন পদ্ধতির উপরই তৎকালীন বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, ধারণা-সমষ্টি, পরিশীলন-সম্পদ গড়ে' ওঠে। সংক্ষেপে সমাজ-মন্দিরের ভিত্তি অনুযায়ী তার সকল অঙ্গ ও শিখর রূপ পরিগ্রহ করে।

তাহ'লে সমাজ-প্রগতির ইতিহাস সর্ব্বোপরি সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতির—উৎপাদিকা-শক্তির ও ধনোৎপাদনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিবর্ত্তনশীল সম্বন্ধের—অগ্রগতিরই ইতিহাস। যে-সব শ্রম-জীবীরা ধনোৎপাদনের প্রধান শক্তি এবং সমাজের পুষ্টিসাধনে ধনোৎপাদন করে' থাকে, সেই সব শ্রমজীবিদের ইতিহাসই হ'চ্ছে সমাজ-প্রগতির ইতিহাস। রাজা মহারাজা রাষ্ট্রবিজেতা ও বিজিতের কথা-কাহিনীর নগণ্যবেশই সমাজ-জীবনের ইতিহাস নয়—ধনোৎপাদনকারী, শ্রমজীবী মানবের ইতিহাস পর্য্যালোচনা ব্যতীত সমাজ-জীবনের ইতিহাসের ধারা নির্ণয় দুঃসাধ্য। সমাজ-জীবনের ইতিহাসের মূলসূত্র যুগবিশেষে সে-যুগের সামাজিক উৎপাদন-পদ্ধতির,—সমাজের আর্থিক জীবনধারার মধ্যে নিহিত। এর সন্ধান মানুষের মনোজগতে, তার ধারণা সমষ্টি, সমাজের চিন্তাধারার ভিতর পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিক মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে উৎপাদন-পদ্ধতির সূত্রাবলীর, উৎপাদিকা-শক্তির শ্রীবৃদ্ধির ও ধনোৎপাদনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিবর্ত্তনশীল সম্বন্ধের—যথার্থ বিশ্লেষণ করা।

(২) উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত উৎপাদিকা-শক্তির পরিবর্ত্তন ও শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে। আবার উৎপাদন-যন্ত্রপাতির বিবর্ত্তনই এসব পরিবর্ত্তনের গোড়ার কথা। উৎপাদিকা-শক্তি সততই পরিবর্ত্তনশীল এবং বিপ্লবমুখী। প্রথমে সমাজের উৎপাদিকা-শক্তির পরিবর্ত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, পরে এই পরিবর্ত্তনের উপর ভিত্তি করে' এর সাথে খাপ খাইয়ে মানুষের ধনোৎপাদন-সম্বন্ধের পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। অবশ্য উৎপাদিকা-শক্তি উৎপাদন সম্বন্ধের প্রভাব-বর্জ্জিত নয়। উৎপাদন সম্বন্ধের প্রগতি যেমন উৎপাদিকা-শক্তির শ্রীবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল, তেমন উৎপাদন-সম্বন্ধের প্রতি-ঘাতের ফলে উৎপাদিকা শক্তির শ্রীবৃদ্ধি বা অবনতি ঘটে' থাকে। বহুকালের জন্য উৎপাদিকা শক্তির প্রগতি থেকে পিছিয়ে থাকা এবং তার প্রসারের বিরোধিতা করা উৎপাদন-সম্বন্ধের পক্ষে অসম্ভব—উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণবিকাশ তখনই সম্ভব যখন উৎপাদন-সম্বন্ধের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিদ্যমান এবং

তার বিকাশের পথে উৎপাদন-সম্বন্ধ প্রতিবন্ধক নয়, সহায়ক। উৎপাদন সম্বন্ধ অধিককালের জন্য পিছিয়ে থাকতে পারে না—উৎপাদিকা শক্তির প্রগতির সাথে তার সমান তালে পা ফেলে চলতে হবে, অন্যথায় উৎপাদন-পদ্ধতিতে সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী এবং ফলে উৎপাদিকা শক্তির ক্ষয় সুনিশ্চিত।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আজ আর্থিক সঙ্কট সুবিদিত—কিন্তু এই আর্থিক সঙ্কট আপতিক নয়। উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্বন্ধের অসামঞ্জস্যই এর মূল কারণ। বর্ত্তমানে উৎপাদিকা-শক্তির ক্রমোন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধ, উৎপাদন সরঞ্জামে মূলধনী মালিকের ব্যক্তিগত অধিকার। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধ আজ উৎপাদিকা-শক্তির শ্রীবৃদ্ধির পথে শৃঙ্খল বিশেষ। তাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ঘন ঘন আর্থিক সঙ্কটের আবির্ভাব এবং ফলে উৎপাদিকা শক্তির প্রচুর ক্ষয় লক্ষিত হয়। কিন্তু এই অসামঞ্জস্যই সমাজ-বিপ্লবের আর্থিক ভিত্তি—সমাজ-বিপ্লবের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে বর্ত্তমান উৎপাদন-সম্বন্ধের ধ্বংস সাধন এবং উৎপাদিকা-শক্তির প্রয়োজনীয় নতুন উৎপাদন সম্বন্ধের সৃষ্টি করা। সমাজ-বিপ্লবের ফলে সোভিয়েট রাশিয়ায় আজ সোস্যালিজম সুপ্রতিষ্ঠিত। সেদেশে আর্থিক সঙ্কট অজ্ঞাত, উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষয় সুদূর পরাহত, উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্বন্ধের এক সুমধুর সামঞ্জস্য বিরাজমান। সোভিয়েট রাশিয়ার উৎপাদিকা-শক্তির ক্রমোন্নতি আজ ধনতান্ত্রিক জগতে এক প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদিকা-শক্তি শুধু পরিবর্ত্তনশীল ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সূত্র নয়, উৎপাদন-পদ্ধতির ক্রমোন্নতির নিয়ন্ত্রকও।

ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে উৎপাদিকা-শক্তি দেখে ধনোৎপাদনের যন্ত্রপাতির স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব। আবার উৎপাদন-সম্বন্ধ দেখে উৎপাদন-সরঞ্জাম (ভূমি, বন, নদনদী, খনি, কাঁচামাল উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, উৎপাদন গৃহ, যানবাহনাদির ব্যবস্থা প্রভৃতি) সমগ্র সমাজের, না একটী বিশিষ্ট শোষকশ্রেণীর সম্পত্তি তা স্থির করা সহজ সাধ্য।

আদিম যুগের প্রস্তর নির্ম্মিত হাতিয়ার, তীর ধনুক প্রভৃতির ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান যুগের বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাব। উৎপাদিকা শক্তির এই ক্রমোন্নতি উৎপাদন-রত মানুষের কর্ম্ম প্রচেষ্টার ফল—সমবেত মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে এ কাজ অসম্ভব ছিলো। আবার উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে—তার উৎপাদন অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, উৎপাদন-যন্ত্রপাতি পরিচালনায় কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদিকা শক্তির এই বিবর্ত্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মানুষের উৎপাদন সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে বিপুল।

ইতিহাসের বিবর্ত্তন ধারায় প্রধানতঃ পাঁচপ্রকারের—আদিম গোষ্ঠী, দাসত্ব, ফিউডাল, ধনতান্ত্রিক, সোস্যালিষ্ট—উৎপাদন-সম্বন্ধ আমরা দেখ্‌তে পাই।

(ক) আদিম-গোষ্ঠী প্রথায় উৎপাদন-সরঞ্জাম সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ছিল এবং তার ওপর ভিত্তি করে' গড়ে' উঠেছিল তখনকার দিনের উৎপাদন-সম্বন্ধ। উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধের তখন এক অবাধ সামঞ্জস্য ছিল। শুধু প্রস্তর নির্ম্মিত হাতিয়ার, তীর ধনুকের সাহায্যে নিসঙ্গ ভাবে প্রকৃতির শক্তি ও বন্যপশুর সঙ্গে যুঝে ওঠা ছিল মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। ফল আহরণে, মৎস্য শীকারে বাসস্থান নির্ম্মাণে মানুষের একযোগে কাজ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না—প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী

দল, বন্যপশু, অনাহার ও মৃত্যুর খর্পর থেকে আত্মরক্ষার্থে মানুষের একত্র কাজ করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। একযোগে কাজ করার ফলে উৎপাদন-সরঞ্জাম ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর সমাজের সাধারণ স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল।—বন্যপশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত কতগুলি উৎপাদন—হাতিয়ার ব্যতীত উৎপাদন-সরঞ্জামের উপর কারও কোন ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। তখন শোষণ ও শ্রেণীর আবির্ভাব হয়নি।

(খ) দাসত্ব-প্রথায় উৎপাদন-সরঞ্জাম ছিল ক্রীতদাস প্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ধনোৎপাদনে প্রভুরাই শ্রমিকের, ক্রীতদাসের স্বত্বাধিকারী; জীব-জন্তুর ন্যায় ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের ও হত্যার অধিকার তাদের ছিল। এমনতর ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে' গড়ে' উঠেছিল তখনকার দিনের উৎপাদন-সম্বন্ধ এবং উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে তার বেশ সামঞ্জস্য ছিলো। সমাজের ক্রমোন্নতির পথে প্রস্তর-নির্ম্মিত হাতিয়ারের পরিবর্ত্তে মানুষের হাতে এল ধাতুনির্ম্মিত হাতিয়ার, ব্যাধজীবনের নগণ্য চাষের পরিবর্ত্তে দেখা দিল রীতিমত চাষাবাদ, কারুশিল্প এবং উৎপাদনের বিভিন্ন-শাখায় শ্রম-বিভাগ। ফলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, এক সমাজের সঙ্গে অন্য এক সমাজের দ্রব্য বিনিময়ের ব্যবস্থা হ'ল; সমাজের সম্পদ ও উৎপাদন-সরঞ্জাম মুষ্টিমেয় ধনিকের কুক্ষিগত হওয়ায়, সমাজে সংখ্যা গরিষ্ঠের উপর সংখ্যা লঘিষ্ঠের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এবং তাদের ক্রীতদাসে পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল। এখানে উৎপাদন-পদ্ধতিতে সেই আদিম গোষ্ঠি-প্রথার সাধারণ মুক্ত শ্রম আর দৃষ্টিগোচর হয় না—অ-শ্রমজীবী ক্রীতদাস-প্রভুদের খর্পরে শোষিত ক্রীতদাসের বাধ্যতামূলক শ্রমই এখানে বিরাজমান। ক্রীতদাস-প্রভুরাই সমস্ত সম্পদের অধিকারী। উৎপাদন সরঞ্জাম ও উৎপন্ন দ্রব্যে জনসাধারণের স্বত্বের পরিবর্ত্তে প্রবর্ত্তিত হ'ল ক্রীতদাস-প্রভুদের ব্যক্তিগত অধিকার। ধনী ও নির্ধন, শোষক ও শোষিত এবং এদের ভিতর প্রবল শ্রেণীসংঘর্ষ—এই হ'ল দাসত্বপ্রথার বাস্তব চিত্র।

(গ) ফিউডালতন্ত্রে উৎপাদন সরঞ্জাম ছিল ভূস্বামীদের অধিকারে, কিন্তু ধনোৎপাদনে শ্রমিকদের—অর্দ্ধদাসদের উপর ভূস্বামীদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছিল না। ক্রীতদাসের ন্যায় ভূস্বামীরা অর্দ্ধদাসদের ক্রয়-বিক্রয় করতে পারতো, কিন্তু হত্যা করতে পারতো না। ভূস্বামীদের এই স্বত্বাধিকারের পাশাপাশি কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, কারিগরদের তাদের ব্যক্তিগত যন্ত্রপাতি ও শ্রমের সাহায্যে নিজেদের ব্যবসা-বিস্তারের সুবিধা ছিল। এমনতর ব্যবস্থায় তৎকালীন উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে গড়ে' উঠেছিল ফিউডাল তন্ত্রের উৎপাদন-সম্বন্ধ। সেকালে উৎপাদিকা-শক্তির শ্রীবৃদ্ধির পথে লৌহকার্য্যের প্রসার, লৌহ-লাঙ্গলের প্রবর্ত্তন, তাঁতের প্রচলন, কৃষি-কার্য্য ও কারুশিল্পের উন্নতি, কারিগরদের কারখানার পার্শ্বে যন্ত্রগৃহের আবির্ভাব দেখা যায়। উৎপাদিকা-শক্তির এই শ্রীবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকেরা ধনোৎপাদনে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল—দাসত্ব প্রথায় এ মনোভাবের সন্ধান মেলা দুষ্কর। সুতরাং, ভূস্বামীদের ক্রীতদাসদের ত্যাগ করে' অর্দ্ধদাসদের নিয়ে কাজ করতে উৎসুক হ'য়ে ওঠা স্বাভাবিক। অর্দ্ধ-দাসদের ধনোৎপাদনের নিজস্ব যন্ত্রপাতি এবং কৃষিকার্য্যে একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। অর্দ্ধ-দাসদের কাছ থেকে ফসলের একটা অংশ গ্রহণ করে' বিনা পরিশ্রমে ও বিনাব্যয়ে লভ্যাংশ বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা ভূস্বামীদের ছিল—তাই ক্রীতদাসদের উপর

তাদের আর আকর্ষণ রইল না। তাছাড়া ক্রীতদাস-প্রথায় ভূস্বামীকে ক্রীতদাসদের ভরণ-পোষণ করতে হ'ত, অর্দ্ধ-দাসদের ক্ষেত্রে সে-দায় ও ঝঞ্ঝাট থেকে ভূস্বামীরা ছিল মুক্ত। এমিভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা আরো উন্নত হ'ল। শোষণের রূপটা যদিও একটু পরিবর্ত্তিত হ'ল, কিন্তু শ্রেণী সংঘর্ষের রূপটা পরিবর্দ্ধিত আকারে দেখা দিল।

(ঘ) ধনতন্ত্রে উৎপাদন-সম্বন্ধের মূল কথা হ'চ্ছে উৎপাদন-সরঞ্জামে ধনিকের ব্যক্তিগত-স্বত্বাধিকার। উৎপাদন-সরঞ্জাম ধনিকেরই কুক্ষিগত। কিন্তু ধনোৎপাদনকারী শ্রমিকের উপর ধনিকের কোন স্বত্ব নেই, শ্রমিককে ধনিক ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না, ব্যক্তিগত জীবনে সে মুক্ত। অবশ্য শ্রমিকের এ-মুক্তি অর্থহীন, কারণ উৎপাদন-সরঞ্জামে তার কোন অধিকার নেই—জীবন-ধারণের জন্য ধনিকের কাছে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতেই হয়। ধনতন্ত্রে শোষণের অক্টোপাসে শ্রমিকদের জীবন বিপন্ন, যদিও বাহ্যতঃ তারা শৃঙ্খল-মুক্ত। ক্রীতদাস প্রথায় শোষণ ছিল ব্যক্ত, ক্রীতদাসদের জীবন-ধারণের ব্যবস্থা যে প্রভুরা করত সেটা ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, আবার ফিউডাল সমাজে অর্দ্ধ-দাসদের শোষণ ও তাদের পরিশ্রমের মূল্য প্রদান কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট ছিল, কিন্তু ধনতন্ত্রে শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে শোষণের স্বরূপটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংজ্ঞায় আবৃত।

ধনতন্ত্রে উৎপাদন সরঞ্জামে ধনিকদের ন্যায় কৃষক ও কারিগরদের ব্যক্তিগত অধিকার লক্ষিত হয়। এখন আর তা'রা অর্দ্ধদাস নয়। কারিগরদের কারখানা, যন্ত্রগৃহের স্থলে যন্ত্রসজ্জিত বৃহদাকার মিল, ফ্যাক্টরী, কৃষকদের আদিম চাষব্যবস্থার স্থলে বিজ্ঞানানুসারে পরিচালিত, কৃষি-যন্ত্রে সুসজ্জিত ধনিকদের বিরাট বিরাট চাষ-কেন্দ্র আজ ধনতন্ত্রের শোভা বর্দ্ধন করছে। এই নূতন উৎপাদিকা-শক্তির আবির্ভাবে অজ্ঞ, নিষ্পেষিত অর্দ্ধদাস দিয়ে ধনোৎপাদন অসম্ভব—শ্রমিকদের শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও যন্ত্র-পরিচালনায় সুদক্ষ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই ধনিকদের দৃষ্টি আজ সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত, যন্ত্র-পরিচালনায় সুদক্ষ শ্রমজীবিদের উপর—ক্রীতদাস বা অর্দ্ধদাস দিয়ে তাদের কর্ম্ম সম্পাদন বা ধনোৎপাদন অসম্ভব।

কিন্তু উৎপাদিকা-শক্তির দ্রুত প্রসারের ফলে ধনতন্ত্র আজ এমি এক অন্তর্বিরোধের সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে যে তার সমাধান করা ধনিকের পক্ষে দুঃসাধ্য। ধনতন্ত্রে প্রচুর পরিমাণে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন লক্ষ্য করবার বিষয়। সুতরাং পণ্যের দাম কমিয়ে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে' বাজার অধিকার করবার চেষ্টা ধনিক প্রভুদের পক্ষে স্বাভাবিক। এবং সে-চেষ্টা ধনিক প্রভুরা খুব ভালোভাবেই করছে। ধনিক প্রভুদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া ছোট ছোট ব্যবসাদার ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাদের আজ দুর্গতির সীমা নেই—ধনতন্ত্র দিন-দিন তাদের প্রোলেটারিয়েট পর্য্যায়ভুক্ত করে' তুলেছে এবং তাদের ক্রয়-শক্তি সঙ্কুচিত করছে। ফলে যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে না। অন্যদিকে ধনোৎপাদনের প্রকৃত প্রসার ও বৃহদাকার মিল, ফ্যাক্টরিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সমাবেশ করে' ধনতন্ত্র অজ্ঞাতে উৎপাদন-পদ্ধতিতে একটা সামাজিক রূপের সৃষ্টি করছে, এবং তার নিজের ধ্বংসের ব্যবস্থা করছে। ধনতন্ত্রের আজ ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা—উৎপাদন-পদ্ধতির সামাজিক রূপ দাবী করছে উৎপাদন সরঞ্জামে সমাজের সাধারণ-স্বত্ব, কিন্তু উৎপাদন সরঞ্জাম আজও ধনিকের কুক্ষিগত।

তাই ধনতন্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্বন্ধের নিরন্তর দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক এবং দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হয় আর্থিক সঙ্কটে। পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধিই আর্থিক সঙ্কটের মূলসূত্র—মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করতে গিয়ে জনগণকে ধ্বংসের আবর্ত্তে নিমজ্জিত করার ফলে উৎপন্ন পণ্য সামগ্রীর চাহিদার সঙ্কোচন দেখা দেয়। ধনিকেরা তখন পণ্যসামগ্রী পুড়িয়ে ফেলে, উৎপাদিকা শক্তির ধ্বংস সাধন করে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বেকার ও পথের ভিখারী করে। পণ্যসামগ্রীর অভাবই যে এই সমস্ত শ্রমিককে বেকার করে তা নয়—পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধিরই এ ফল।

উপরের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সমাজের উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধ সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্বন্ধ সমাজের উৎপাদিকা শক্তির প্রগতি-পথে শৃঙ্খল বিশেষ, উৎপাদিকা-শক্তির শ্রীবৃদ্ধির এ প্রতিবন্ধক। ধনতন্ত্র আজ এক প্রবল বিপ্লবের গুরুভারে ভারাক্রান্ত—সে-বিপ্লবের উদ্দেশ্য উৎপাদন-সরঞ্জামে বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক স্বাধিকারের বিলোপ সাধন করে' সমাজের সাধারণ স্বত্বের প্রতিষ্ঠা করা। তাই অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের ভিতর ভীষণ শ্রেণী-সংঘর্ষই ধনতন্ত্রের বিশিষ্ট রূপ।

(ঙ) সোস্যালিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্বন্ধের মূলসূত্র উৎপাদন-সরঞ্জাম সমাজের সাধারণ স্বত্বের মধ্যে নিহিত। সোভিয়েট রাশিয়ায় আজ সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠিত—শোষণকারী বা শোষিতের স্থান সেখানে নেই। শ্রম অনুপাতে উৎপন্ন সামগ্রীর বিলি-ব্যবস্থা সেদেশে প্রচলিত—যে কাজ করে না, সে খেতে পাবে না। ধনোৎপাদনে শোষণমুক্ত কৃষক ও শ্রমিকদের ভিতর অপূর্ব্ব সহযোগ বিদ্যমান। উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধের এক অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সেদেশে দৃষ্ট হয়—আর্থিক সঙ্কট সেখানে অস্বাভাবিক, অর্থহীন। উৎপাদন সম্বন্ধ সেখানে উৎপাদিকা-শক্তির ক্রমোন্নতির সহায়ক। তাই সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপাদিকা-শক্তির শ্রীবৃদ্ধি দেখে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি আজ স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত।

(চ) নূতন উৎপাদিকা-শক্তি ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎপাদন সম্বন্ধের আবির্ভাব কিন্তু পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরেই—পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসের পর নূতন সমাজব্যবস্থার ভিতর নয় আবার এদের অভ্যুত্থান মানুষের ইচ্ছাকৃত ও সচেতন কর্ম্মের ফলে নয়—মানুষের সঙ্কল্পের বাইরে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বাধীনভাবে এদের আবির্ভাব এবং প্রধানতঃ দ্বিবিধ কারণে সেটা ঘটে' থাকে।

প্রথমতঃ, ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রণালী নিরূপণ ব্যাপারে মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই। পূর্ব্বপুরুষের কৃত উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্বন্ধের ভিতরই এসে মানুষ পড়ে এবং সেই অনুযায়ী প্রচলিত ব্যবস্থা মেনে নিয়ে তাকে প্রথমে কাজ করতে হয়—অন্যথায় তার পক্ষে ধনোৎপাদন ও জীবনধারণ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ধনোৎপাদনের যন্ত্রপাতির—উৎপাদিকা-শক্তির যে কোন একটীর উন্নতি করতে করতে মানুষের দৃষ্টি থাকে তার দৈনন্দিন স্বার্থের দিকে। সে ভাবে তার শ্রম লাঘবের কথা, কি করে' যন্ত্রপাতির উন্নতি করে' তার লভ্যাংশ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তির এই উন্নতির ফলে সমাজে কি পরিবর্ত্তন হবে—সে-কথা সে আদৌ চিন্তা করে না, ভাবতে পারে না—এ তার চিন্তা-শক্তির বহির্ভূত।

আদিম গোষ্ঠী প্রথায় মানুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে' প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার স্থলে লৌহনির্মিত হাতিয়ারের প্রবর্তন করল তখন তারা এর সামাজিক ফলাফল চিন্তা করে নি—এই নূতন হাতিয়ারের প্রবর্তন সমাজে কী পরিবর্তন ঘটাবে তাও তারা ভেবে দেখে নি। উৎপাদন যন্ত্রের এই শ্রীবৃদ্ধি যে ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এবং পরিশেষে এ যে সমাজকে দাসত্ব-প্রথায় এগিয়ে নিয়ে যাবে—তা ছিলো তাদের বোধগম্যের বাইরে। তাদের তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল যে কোন ভাবে শ্রমের লাঘব করে' নিজেদের দৈনন্দিন অবস্থার উন্নতি করা।

ফিউডাল তন্ত্রে যখন নবীন বুর্জোয়ারা ইউরোপে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কারখানার পার্শ্বে বৃহদাকার যন্ত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা করে সমাজের উৎপাদিকা-শক্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করছিল তখন তারা এর সামাজিক পরিণাম কল্পনা করে' দেখেনি। নব নব যন্ত্রগৃহের প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তিই ছিল তাদের প্রধান সহায়, কিন্তু তখন তারা ধারণা করতে পারেনি যে তাদের এই নবাবিষ্কার সমাজের শক্তিগুলিকে নবপর্য্যায়ভুক্ত করে' রাজা, ভূস্বামীর বিরুদ্ধেই এক বিপ্লবের সূচনা করবে। ধনোৎপাদনে ব্যয়-সঙ্কোচ, এসিয়া ও নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ প্রসার ও মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করা ছিল তাদের লক্ষ্য।

জায়গীরদার ও কৃষকদের উপর জমিদারদের শোষণ করবার অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে রুষীয় ধনিক সম্প্রদায় বিদেশী ধনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশময় বিরাট বিরাট মিল, ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু যন্ত্রশিল্পের বহুল প্রসার—উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত উন্নতির সামাজিক পরিণাম সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সমাজের উৎপাদিকা-শক্তির এই বিবর্তন যে সামাজিক শক্তিগুলিকে নব পর্য্যায়ভুক্ত করবে এবং ফলে শ্রমিকদের যে কৃষকদের সঙ্গে একত্রিত হবার ও সোস্যালিষ্ট বিপ্লব জয়যুক্ত করবার সুযোগ মিলবে—এ-কথা রুষদেশের ধনিক সম্প্রদায় সেদিন কল্পনাও করতে পারে নি। তারা চেয়েছিল দেশময় যন্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রসার, দেশের বাজারের উপর একাধিপত্য, ধনোৎপাদনে এক চেটিয়া কর্তৃত্ব ও যতদূর সম্ভব-মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি। তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের ঐশ্বর্য্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকেরা এসেছিলো বাণিজ্য করতে—তাদের মুনাফার অঙ্ক বাড়াতে। ভারতে তখন প্রচলিত ছিল আদিম এসিয়ার সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রাচ্যের ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থা। সে ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থায় দেশের সমস্ত জমির উপর ছিল রাষ্ট্রের স্বত্বাধিকার দেশের সমস্ত জনহিতকর কার্য্য, বিশেষ করে' জলসেচনের ব্যবস্থা রাষ্ট্রেরই করতে হ'ত এবং গ্রামের পঞ্চায়েতের কাঠামোর ভিতর শিল্প ও কৃষিকার্য্যের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রন ছিল। আরব তুর্ক, মুঘলদের আক্রমণ এ সমাজ ব্যবস্থাকে বিকল করতে পারে নি, কারণ তাদের সমাজ-ব্যবস্থার তুলনায় এ সমাজ-ব্যবস্থা অনেক উন্নত স্তরের ছিল। তাই তারা দেশ জয় ক'রেও এ দেশের সভ্যতার নিকট নতি স্বীকার করে' প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইংরাজ বণিকদের আগমনে ফলটা হ'ল বিপরীত। তারা নিয়ে এলো ধনতন্ত্রের বীজ—তাদের দেশ তখন ধনতন্ত্রের বিকাশের পথে। প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকেরা ভারতের ব্যবসায় প্রচুর লাভ করে' ভারতের কাঁচা মাল দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে' প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করল (অবশ্য ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়)। ভারতীয়

শিল্পের ধ্বংসের ফলে, জমিই জনগণের জীবিকা-সংস্থানের একমাত্র আশ্রয়স্থল হ'য়ে দাঁড়াল। স্বার্থান্বেষী ইংরেজ ধনিকেরা শুধু যে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংসসাধন করেই নিশ্চিন্ত ছিল তা নয়, ভারতের বাজারকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে শোষণ করবার জন্য ভারতে ইংরেজ শাসনের তা'রা ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলো। এ ব্যবস্থায়ও তৃপ্ত না হ'য়ে বেশী লাভের প্রত্যাশায় ভারতে যন্ত্রশিল্পের উৎকর্ষের জন্য তারা তাদের সঞ্চিত মূলধন খাটাতে সুরু করলো। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য রেল লাইনের প্রবর্তন হ'ল। ধীরে ধীরে ভারতীয় বুর্জোয়াদের ও প্রোলেটারিয়েটদের আবির্ভাব দেখা দিল। সংক্ষেপে মুনাফার অঙ্ক বাড়াতে এসে ইংরেজ ধনিকেরা ভারতের ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন ও ভারতে ধনতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। ফলে একদিকে উদীয়মান দেশীয় বুর্জোয়ারা দেশময় যন্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রসারে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে এবং তাতে প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে ইংরেজ ধনিকেরা দেশীয় বুর্জোয়াদের শ্রীবৃদ্ধির পথে দিন দিন প্রবল বাধা সৃষ্টি করছে; অন্যদিকে ভারতীয় প্রোলেটারিয়েট ও কৃষকেরা বৃটিশ শাসক ও দেশীয় বুর্জোয়াদের শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ইংরেজ শাসন মুঘল শাসনের তুলনায় ভারতের রাজনৈতিক একতাকে অধিকতর সুসংবদ্ধ করেছে। এমিভাবে ইংরেজ ধনিকেরা ভারতবর্ষে নিজেদের ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু যখন তারা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে, ইংরেজ শাসন, রেল লাইন, যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন করেছিল তখন তারা এর সামাজিক ফলাফল কল্পনাও করতে পারে নি—তাদের দৃষ্টি ছিল কী করে' লভ্যাংশ বাড়ানো যায়, কী করে' ভারতের মতন বিরাট জনপদকে শোষণ করে' সমৃদ্ধশালী হওয়া যায়। ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস স্তূপের উপর ধনতন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে উৎপাদিকা-শক্তির উন্নতির সামাজিক পরিণাম সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল—ভারতের বাজারের উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাদের লক্ষ্য।

মার্কসের মতে সমাজের ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের এক অপরিহার্য্য নিদ্দিষ্ট সম্বন্ধ গড়ে' ওঠে। যুগবিশেষে সে-যুগের উৎপাদিকা-শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৎকালীন উৎপাদন সম্বন্ধের আবির্ভাব হয়। স্তর থেকে স্তরান্তরে উৎপাদন সম্বন্ধের পরিবর্তন সহজে হয় না—বিপ্লবের পথেই এ-পরিবর্তন ঘটে, পুরাতন উৎপাদন সম্বন্ধের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নূতন উৎপাদন সম্বন্ধের উত্থান। একটা বিশিষ্ট স্তর থেকে উৎপাদিকা শক্তির ক্রমোন্নতি এবং উৎপাদন সম্বন্ধের বিবর্ত্তন মানুষের সংকল্পের বাইরে ঘটে' থাকে। কিন্তু যখন নতুন উৎপাদিকা শক্তির আবির্ভাব হয় তখন প্রচলিত উৎপাদন-সম্বন্ধ ও তার পরিপোষক শাসকশ্রেণী নতুন উৎপাদিকা শক্তির প্রগতিপথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সে-প্রতিবন্ধকের অপসারণ নবজাগ্রত শ্রেণীর সচেতন কর্ণধারায়, তাদের শক্তি প্রয়োগে—সংক্ষেপে বিপ্লবেই সম্ভব। নতুন উৎপাদিকা শক্তি ও পুরাতন উৎপাদন সম্বন্ধের দ্বন্দ্ব ও সমাজের নতুন আর্থিক দাবীর ফলে নতুন সামাজিক চিন্তাধারার আবির্ভাব দেখা দেয়।—এই নব চিন্তাধারা জনগণকে সংঘবদ্ধ করে, তাদের ভিতর রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলে। ফলে এক বিপ্লবীশক্তির সৃষ্টি হয়। জনগণ আবার এই বিপ্লবী শক্তিকে পুরাতন উৎপাদন সম্বন্ধের ধ্বংস সাধনার্থে এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যবহার করে। স্বতঃস্ফূর্ত্ত উন্নতির পদ্ধতি মানুষের

সচেতন কর্ম্মের, শান্ত ধীর স্থির প্রগতি বিরাট পরিবর্ত্তনের, বিবর্ত্তন বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে' দেয়।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা উচিত যে মার্কস কখনও যান্ত্রিকভাবে বিবর্ত্তনের কল্পনা করেন নি। ভারতবর্ষ আজ আর্থিক ব্যাপারে অনুন্নত। তাই আমাদের দেশের রাজনীতি-বিশারদেরা মার্কসের পুঁথিপত্রের দোহাই দিয়ে প্রচার করে' থাকেন যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমিকবিপ্লব, সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠার কথা উঠতেই পারে না, ভারতবর্ষে প্রথম স্থাপিত হবে য়ুরোপের অনুরূপ উদার গণতন্ত্র ও বুর্জ্জোয়াদের কর্ত্তৃত্ব, পরে সময় মত দেশ উন্নত হ'লে আসবে সোস্যালিজম। মার্কসবাদের এম্নিতর বিকৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি এড়ানো দুষ্কর। ধনতন্ত্র এখন পৃথিবীব্যাপী, কাজেই আমাদের ভারতবর্ষ য়ুরোপে আমেরিকার ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতন অগ্রসর না হ'লেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে পড়েছে। অন্তর্বিরোধের ফলে পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্র ভেঙে পড়বেই এবং সে ভেঙে-পড়াকে লেনিন টানের চোটে শৃঙ্খল ছেঁড়ার সাথে তুলনা করেছিলেন। শৃঙ্খল যে ছিঁড়বে-সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে কোন্ জায়গায় ছিঁড়বে তা আগে থাকতে জানা যায় না। কিন্তু দুর্ব্বলতম স্থানে শৃঙ্খল ছিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং ধনতন্ত্রের ব্যবস্থা যেখানে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে সেখানে শ্রমিক-বিপ্লব ঘটতে পারে—মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়ায় তাই হয়েছিল। তাই আর্থিক ব্যাপারে অনুন্নত হ'লেও ভারতবর্ষেই শ্রমিক-বিপ্লব সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়—ভারতবর্ষ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটী দুর্ব্বল স্থান। তা ছাড়া ভারতের প্রোলেটারিয়েটদের ভিতর দিন-দিন শ্রেণী-প্রত্যয় জাগ্রত হচ্ছে এবং তা'রা বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে। চীনের প্রোলেটারিয়েটদের ন্যায় তারাও আজ দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটী বিশিষ্ট মিত্রশক্তি।

বিবর্ত্তন ও বিপ্লবের ভিতর দিয়েই ইতিহাসের গতিধারা। সংক্ষেপে ইতিহাসের মূলসূত্র ধনোৎপাদনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিবর্ত্তনশীল সম্বন্ধের মধ্যে। আদিম গোষ্ঠী-প্রথাকে বাদ দিলে সেই সম্বন্ধ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্তর অর্থাৎ শ্রেণীর রূপ নিয়েছে। এই বিভিন্ন শ্রেণীর ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রমবিকাশ ইতিহাসের মূল কথা। ইতিহাসের পর্য্যায়ক্রমের প্রাণবস্তু হচ্ছে শ্রেণীর উত্থান পতন অর্থাৎ শ্রেণীসম্বন্ধের ক্রমবিকাশ। তাই মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছিলেন—ইতিহাসের সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার (আদিম গোষ্ঠী-প্রথাকে বাদ দিয়ে) ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীসংঘর্ষের ইতিহাস।

ফাঁকি

জ্যোতির্ম্ময় রায়

যাদের চলেনা কিছুই কিন্তু চালাতে হয় অনেক-কিছু, তাদেরই একজন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ীওলার মুখ থেকে শুনতে হয়েছে, 'আপনার চলছে সবই, যত গোলমাল আমার ভাড়ার বেলায়।' মুদি বলে, 'সবই চলছে, চলে না শুধু আমার পাওনাটা।' দুধওলা, কয়লাওলার মুখেও ঐ একই কথা শুনতে হয় তাদের—সবই যখন চলছে তখন তাদের পাওনা নিয়ে টানাবাহানা করলে তারা মানবে কেন!

সব চলছে বলেই যেন তারা টাকা চাইতে আসে, নইলে যেন তাকে রেহাই দিত। তাদের চুপ করে' শোনে। বলে না কিছুই—কি-ই বা তার বলবার আছে!

খামোকা বিছানার তোষকটা একবার উল্টে-পাল্টে দ্যাখে, জানে তলায় কিছু নেই—তবু। পুরনো অভ্যাসের জের টানা। এক সময় পকেটের খুচরো পয়সাগুলো-ছুড়ে দিতো বিছানার তলায়, নেহাৎ কখনো-সখনো দরকার পড়লে ওতে হাত পড়তো।

সুধার টাকাটায় দু'দিন কোনোরকমে চলেছে। টাকা দেবার সময় সুধা বলেছিলো আর নাকি একটা তামার পয়সাও তার কাছে নেই। ঠেকা-বেঠেকার জন্যে সামান্য-কিছুও কি হাতে রাখে নি? অমন আরও তো ক'দিন বলেছে, এই শেষ।

কিন্তু সেদিনকার বলবার ধরণটা ছিল যেন একটু অন্যরকম, অবিশ্বাস হতে চায় না। তবু সুধাকে সে ডাকে একবার জিজ্ঞেস করবার জন্যে।

সুধা এক কোণে গোঁজ হয়ে বসে' ছিল। ভেজা চোখে এসে শুভেন্দুর সামনে দাঁড়ালো। খানকয়েক ঘুঁটের অভাবে বেচারা উনুনে আগুন দিতে পারে নি।

'ঘুঁটের ধোঁয়ায় মানুষের চোখে জল আসে জানতাম, তোমার দেখছি উল্টো—' শুভেন্দু ফ্যাকাসে গলায় এরই মধ্যে একটু কৌতুক করে। 'উনুনে আগুন দিলেই তো আর পেটের আগুন নিভবে না···তবিলে সামান্য-কিছু কি আছে?' শুভেন্দু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো সুধার মুখের দিকে।

জবাবে সুধা নীচের ঠোঁটটা উল্টে দিয়ে মুখ ফেরালো। হঠাৎ রাস্ রক্তটা শুভেন্দুর শিরা-উপশিরায় ছুটোছুটি সুরু করে' দেয়। ওরকম করে' ঠোঁট উল্টে জবাব দেবার মতো কথা এটা নয়। নেই, কোথায় সেটা ভাল করে' বলবে, কি করা যায় তা নিয়ে ভাবিত হয়ে উঠবে, তা না এসেছে দায় সারা জবাব দিতে।

তবিলের শূন্যতা নয়, উত্তর দেবার ভঙ্গীটাই যেন সে সইতে পারে না। তিক্ত মুখে ঝাঁঝিয়া ওঠে, 'সারো বলছি সামনা থেকে! কোনোরকম উপকারে তো আসবেই না, অসময়ে বুদ্ধি করে' একটা কথা বলতে পর্য্যন্ত শেখোনি—অশিক্ষিত জানোয়ার।'

শুভেন্দু উঠে ঘরের ভিতর পাইচারি করতে থাকে। তার ইচ্ছে হয় গলা ছেড়ে খুব খানিকটা গালাগাল করতে, ইচ্ছে হয় ঘরের জিনিষপত্র ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করতে। আবার এ কথাটাও শুভেন্দুর মনে উঁকি দেয় বৈকি, কি এমন কারণ ঘটলো যার জন্মে সে এতটা রেগে যেতে পারে!

উপস্থিত কোন একটা নিৰ্দ্দিষ্ট ঘটনাই যে এর কারণ নয় সেটুকু বুঝবার মতো বিবেচনা-শক্তি শুভেন্দুর আছে। এই রাগ্‌, এতটা ত্যক্ততার পিছনে যে কারণ, তার জন্মে দায়ী করতে পারে এমন একটি লোকও আজ তার আওতার মধ্যে নেই।

একদিন ছিল যখন মাঝে-মাঝে রেগে উঠতে শুভেন্দুর বেশ লাগতো। একটু রাগ করলে মন্দ হয় না, ভেবে নিয়ে হয়তো সে চটে' উঠতো। বাড়ীর সবার মুখে ফুটে উঠতো একটি ভাব, খোকা রাগে না, রাগলে বড়ো ভয়ানক—বেশ উপভোগ করতো সে সবার মুখের ঐ শঙ্কিত ভাবটা। আজ সামনে আছে একমাত্র সুধা। রাগ করবার উৎসাহটাও তার কাছ থেকে পায় না বলে' ভেতরে-ভেতরে সে আরও রেগে যায়। রাগে দুঃখে ঐ একই রকম ভিজে-ভিজে চেহারা নিয়ে সুধার গুম্‌ হয়ে বসে' থাকাটা সে যেন বরদাস্ত করতে পারে না।

ঘরের কোণে ছিল একটা বেতের চেয়ার, বসতে গেলে যেটা চার পা ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। পাইচারি থামিয়ে শুভেন্দু সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো; হঠাৎ হাতে তুলে নিয়ে দুমড়ে মুচ্‌ড়ে সুরু করলো ভাঙতে।

সুধা ভয় পেয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায় শুভেন্দুর দিকে। শুভেন্দু ক্ষেপে গেল নাকি, শেষ পর্য্যন্ত মারধর করবে না তো! তা-ও কি সম্ভব, শুভেন্দু তো তেমন লোক নয়—তবু ভয়ে সুধার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

শুভেন্দু চেয়ারটাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করলো, তারপর টুকরোগুলো পা দিয়ে ঠেলে দিল সুধার সামনে। 'যাও, উনুনটা ধরিয়ে মেয়েটার দুধটা অন্ততঃ চাপিয়ে দাওগে, যাও। বুদ্ধি খরচা করে' যে একটা ব্যবস্থা করবে তা নয়, পারো শুধু চোখের জল ফেলতে।'

বুদ্ধির দৌলতে ঘুঁটের পরিবর্ত্তে একটা ব্যবস্থা করে' দিয়ে শুভেন্দু বেরিয়ে পড়লো।

বেকারত্বের চরম অবস্থায় পদার্পণ করেছে এই প্রথম, তাই ভয়, ভাবনা ও ত্যক্ততাটা শুভেন্দুর বড় বেশী তীব্র।

সারা সকালটা ঘুরে-ফিরেও একটা টাকা শুভেন্দু যোগাড় করতে পারলো না। মাথার উপর রোদটা হয়ে উঠেছে প্রখর, আশায় ঘুরে বেড়াবার মতো ইচ্ছা ও উদ্যম দুটোরই তার ঢিল পড়েছে। আপিসের সময় পেরিয়ে গেছে, বন্ধুবান্ধবও বড় কেউ একটা বাড়ী নেই, কা'র কাছেই বা আর যাবে! আস্তে-আস্তে সে বাড়ী ফিরে এল—এক গেলাস জল খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার না হয় চেষ্টা করে' দেখবে।

বাড়ীতে ঢুকে শুভেন্দু দেখতে পেলো রান্নাঘরের দোর খোলা, সুধা তার পাশের বাড়ীর বন্ধুটির সঙ্গে বসে' গল্প করছে। একপাশে পড়ে' আছে বটি ও তরকারীর ঝুড়িটা, ভাতের ডেক্‌চিটা উনুনে চড়ানো, কিছুটা দূরে একটা থালায় ও দুটো বাটিতে কি সব ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

খুবই একটা নিশ্চিন্ততা ও রাগ নিয়ে শুভেন্দু গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

নিশ্চয়ই সুধার কাছে পয়সা ছিল, তার দেরি দেখে বন্ধুর বাড়ীর চাকরকে দিয়ে কিনেকেটে এনেছে। তার ক্ষমতা সুধা পরখ করে' দেখতে চায় নাকি! নইলে তার কাছে পয়সা থাকতে শুভেন্দুকে রোদ মাথায় করে' দশজনের কাছে অপদস্থ হয়ে বেড়াতে হয় কেন! অবিশ্যি আজ বাদে কাল এম্‌নি করে' বেরুতে তাকে হবেই; নিষ্ফলতা, অপমান, শারীরিক কষ্ট এ সবও মেনে তাকে নিতেই হবে, শুভেন্দু তা জানে, কিন্তু সুধার এ মনোবৃত্তিকে কিছুতেই সে ক্ষমার চোখে দেখতে পারে না।

হয়তো এও হ'তে পারে সুধার কাছে কিছুই ছিল না, ধার নিয়েছে তার এই বন্ধুটির কাছ থেকে। এ চেষ্টাও তো সে অনেক আগেই করতে পারতো। চেষ্টা না করুক, তার সাধ্যের ভেতর এ একটা পথ রয়েছে এটুকু জানিয়ে দু'টো কথা বললেও তো এ দুঃসময়ে মনে শুভেন্দু একটু বল পায়। সুধা হয়তো ভেবেছে খুব একটা বাহবা লুটবে তার কাছ থেকে, আসুক সে, এই মুরুব্বিয়ানার জবাবটা সে এবার ভাল হাতেই পাবে।

সুধার সংগৃহীত অন্ন সে স্পর্শও করবে না, এটা শুভেন্দু মনে-মনে স্থির করে' ফেললো। সে না খেলে সুধাও খাবে না—তা না খাক; এ নিয়ে একটা বোঝা-পড়ার পর সুধা চলে' যাক্ তার ভা'য়ের কাছে, তার কোন আপত্তি নেই—ভাল করে' একবার বুঝে আসুক কষ্টটাই বড়, না মানটা বড়।

মাথার ভিতর এক দঙ্গল চিন্তা নিয়ে শুভেন্দু ঘরের মধ্যে পাইচারি করছিল এমন সময় সুধা এসে ঘরে ঢুকলো।

শুভেন্দু থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে' জিজ্ঞেস করলো, 'বন্ধু চলে' গেছে?'

'হ্যাঁ—'

'ব্যস্‌, আর কিছু শুনতে চাইনে।' চাপা কণ্ঠ যথাসম্ভব কটু করে' শুভেন্দু বলতে লাগলো, 'এখন বলবে তো, আজকের মতো ব্যবস্থা করেছি—যাও, চান করতে যাও। কিন্তু তার আগে—'

আশ্চর্য্য হয়ে সুধা বলে' উঠলো, 'ব্যবস্থা হ'লে তো ও-কথা বলবো, আমি আরো তোমার অপেক্ষায়—' কথা সুধা শেষ করলো না। তার ঠোঁটের কোণে দেখা দিল একটু করুণ হাসি। 'যাক্, বন্ধুকে ঠিকই ঠকাতে পেরেছি, তুমিও যখন ধরতে পার নি—'

'তার মানে?'

'মানে আর কি—ঢুকবার সময় রান্নাঘরটা চোখে পড়েছে, না?—যখন-তখন ও আসে গল্প করতে, তাই দু'একটা থালা-বাটি চাপা দিয়ে ফেলে রেখেছি, ভাতের ডেক্‌চিটায় জল ঢেলে বসিয়ে দিয়েছি উনুনে, খালি-খালি জ্বলবে—এত বেলা হয়ে গেছে, ভারি লজ্জা করে—'

দেখতে-দেখতে দু'চোখ সুধার জলে ভরে' আসে, এলিয়ে-পড়া সেই ম্লান হাসিটুকু তখনও তার ঠোঁটের কোণে।

আর শুভেন্দু—এত বড় একটা কৌতুকের কথা শুনে তারও বুঝি বা হেসে উঠতেই ইচ্ছে করে।

সহরতলী

—দ্বিতীয় খণ্ড—

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ছেলে বা জামাই কেউ সত্যপ্রিয়ের মনের মত নয়। আত্মীয়-পরিজন কেউ যে তার মনের মত তাও অবশ্য নয়, তবু সেটা কোনরকমে সহ্য হইয়া যায়। বড় ছেলে আর বড় মেয়ের জামাই যে তার অপদার্থ এ-আপশোষ মাঝে-মাঝে মানুষটাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলে। সকলকে বড় বড় উপদেশ দেয়, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া সকলকে জানাইয়া দেয়, মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সহজ সরল পথ কি তাই নিয়া গবেষণা করে, আর তার ছেলে আর জামাই এমন! না জানি লোকে কি ভাবে? না জানি তার সব অকাট্য যুক্তিগুলিকে সকলে তার ছেলে আর জামাইয়ের কথা ভাবিয়া অনায়াসে কাটিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া দেয় কিনা?

মেয়েটি সত্যপ্রিয়ের খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু অনেক খুঁজিয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া জামাই আনা হইয়াছে রূপবান। কি রঙ্ জামাইয়ের! যেন সোনার ওজনে সোনার পুতুলই সত্যপ্রিয় কিনিয়া আনিয়াছে মেয়ের জন্য।

একজন আত্মীয়, যে কখনো সত্যপ্রিয়ের কাছে টাকা প্রত্যাশা করে না, সত্যপ্রিয় যাচিয়া দিতে গেলেও বোধ হয় যে বিশেষ দরকারের সময়ও তার টাকা নিবে না, সে সম্বন্ধ ঠিক করার সময় একবার বলিয়াছিল, 'আরেকটু চলনসই পাত্র আনলে কি ভাল হ'ত না হে?'

সত্যপ্রিয় মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল, 'কেন!'

'কি জান, তোমার মেয়েকে যদি পছন্দ না হয়? নিজের চেহারার জন্যেই এ সমস্ত ছেলের মাথা গরম হয়ে থাকে. টাকার লোভে যদি বা বিয়ে করে, খুব সুন্দরী মেয়ে না পেলে নিজের সঙ্গে মানান না ভেবে মনটা হয়তো খুঁত খুঁত করবে।'

'সবাই কি তোমার মত ভাবপ্রবণ ভাই!'

'তা মানুষ একটু ভাবপ্রবণ বৈ কি। টাকা দিয়ে গরীবের ছেলে কিনছ, ছেলে তোমাদের সকলের অনুগত হয়ে থাকবে বটে, কিন্তু তাতে কি ছেলে আর মেয়ের মনের মিল হবে? আর মনের মিল যদি না হ'ল—'

কিন্তু সত্যপ্রিয় বুঝিতে পারে নাই। সে যাকে কিনিয়া আনিতেছে, বাড়ীতে রাখিতেছে, জীবিকার উপায় করিয়া দিতেছে, তার মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়ার মত স্পর্দ্ধা কখনও তার হইতে পারে! বিবাহের এক বছরের মধ্যে মেয়ের মুখের হাসি নিভিয়া যাইতে দেখিয়া সে তাই অবাক হইয়া গিয়াছিল। তারপর চিরস্থায়ী বিষাদ মেয়ের মুখকে আশ্রয় করিয়াছে, কেমন যেন উদাস উদাস চাহনি।

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

অথচ যামিনীর স্বভাব খুব নম্র, তার মত শান্তশিষ্ট নিরীহ গোবেচারী জামাই পাওয়াই কঠিন। সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে কখনো মুখ তুলিয়া কথা বলে না। বাড়ীর কারো সঙ্গে কখনো তর্ক করে না। বৌ-এর সঙ্গে একটা দিনের জন্যও কোনদিন সে কলহ করিয়াছে বলিয়া কেউ শোনে নাই। চরিত্রও তার খারাপ নয়, হঠাৎ বড় লোকের জামাই হইয়া হাতে অনেক টাকা পাইয়াও বাহিরে ফূর্ত্তি করার দিকে তার এতটুকু টান দেখা যায় না।

তবে? যোগমায়া মাঝে-মাঝে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে কেন?

নিরুপায় আপশোষে সত্যপ্রিয়ের হাত-পা কামড়াইতে ইচ্ছা করে। কিছুই করিবার নাই, কিছুই বলিবার নাই। যামিনী যদি মেয়েকে তার মারিত, মদ খাইয়া মাতলামি করিত, কিম্বা অন্য কোন স্পষ্ট অপরাধে মেয়ের চোখে জল আনিত, সে তাকে উপদেশ দিতে পারিত, শাসন করিতে পারিত, চাপ দিয়া সিধা করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু এখানে যে কোন প্যাচ পর্য্যন্ত খাটানোর উপায় নাই! যামিনীর হাতখরচের টাকাটা কোন ছুতায় বন্ধ করিয়া দিলে কি কিছু লাভ হইবে? মেয়ের মনে বরং তাতে কষ্ট হইবে আরও বেশী।

তা ছাড়া সমস্যা তো ও রকম নয়। যে উদ্ধত নয় তাকে নরম করা চলিবে কেমন করিয়া?

একদিন যামিনীর একটু জর হইয়াছে, সামান্য সর্দ্দিজ্বর, ব্যস্ত হওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু সত্যপ্রিয় যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ব্যাকুল হওয়াটাই সত্যপ্রিয়ের পক্ষে খাপছাড়া ব্যাপার, এমন সামান্য ব্যাপারে তাকে ব্যাকুল হইতে দেখিয়া যামিনীও ভয় পাইয়া গেল যে, অসুখটা বুঝি তার ভয়ানক কিছুই হইয়াছে।

নিজে মোটরে করিয়া সত্যপ্রিয় যামিনীকে ডাক্তারের কাছে নিয়া গেল।

ফোনটা তুলিয়া নিয়া একটা করিয়া হুকুম দিলে যার বাড়ীতে ডাক্তারের ভিড় জমিয়া যাওয়ার কথা, জামাইকে দেখানোর জন্য সে নিজে ডাক্তারের বাড়ী যাইবে, এ ব্যাপারটা সকলের বড়ই অসাধারণ মনে হইল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সকলে ঠিক করিল, হয়তো যামিনীর এমন কোন অসুখ হইয়াছে যা পরীক্ষা করিতে বিশেষ কোন যন্ত্রপাতি লাগে, যে-সব যন্ত্রপাতি নিয়া ডাক্তারের আসিবার উপায় নাই। কিন্তু সত্যপ্রিয় নিজে গেল কেন? যদি বা গেল, কাউকে সঙ্গে নিল না কেন? এভাবে সে তো কখনো কোথাও যায় না!

ডাক্তারের বাড়ী দেখিয়া যামিনী অবাক। মারাত্মক রোগ হইয়াছে তার, মস্ত এক ডাক্তারের বাড়ীতে তাকে নিয়া যাওয়া হইতেছে, এই ভাবনায় মুখখানা যামিনীর সর্দ্দিজ্বরের টস্‌টসে ভাবের মধ্যেও শুকনো দেখাইতেছিল। কিন্তু বড় ডাক্তার কি গলির মধ্যে এমন একটা ছোট রঙ্-চটা বাড়ীতে থাকে, এমন চেহারা হয় তার বসিবার ঘরের? পুরানো একটা ওষুধের আলমারি, কয়েকখানা কাঠের চেয়ার আর একটা ময়লা কাপড়-ঢাকা কাঠের টেবিল, তাতে পাঁচ ছ'খানা ডাক্তারি বই। ঘরের মাঝখানে সবুজ রঙ্-করা চটের পার্টিসন দেওয়া, ওপাশে বোধ হয় রোগীকে পরীক্ষা করা হয়।

ডাক্তার সম্ভবতঃ প্রতীক্ষা করিতেছিল, সত্যপ্রিয়কে দেখিয়া খুব বেশী বিস্মিত হইল

না। কেবল মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, 'আসুন, আসুন, বসুন।'

একজন মাত্র রোগী বসিয়াছিল, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যুবক। চেহারাটি শীর্ণকায়, চোখের নীচে কালিপড়া, মুখখানা তেলতেলা। তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য ডাক্তার বলিল, 'আচ্ছা, আপনি দিন সাতেক পরে আবার আসবেন। যা-যা বললাম করবেন আর ওষুধ দু'টো নিয়ম মতো খাবেন।'

'রাত্রে ঘুম হবে তো ডাক্তারবাবু?' যুবকটির গলা খুব মোটা আর কর্কশ কিন্তু কি যে গভীর হতাশা তার প্রশ্ন আর প্রশ্নের ভঙ্গিতে! রাত্রির ঘুমের কথা ভাবিয়া, এখন, এই সকাল বেলাই, সে যেন আতঙ্কে আধমরা হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বলিল, 'হবে। শোবার আগে যে ওষুধটা দিয়েছি, ওটাতেই ঘুম হবে। ঘুম যদি না হয় কাল সকালে একবার আসবেন।'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তোমার রাত্রে ঘুম হয় না?'

অপরিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ছেলেটি এমন করিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল যেন স্নায়ুর কেন্দ্রে ঘা লাগিয়াছে, চোখের পলকে মুখখানা তার ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সত্যপ্রিয়ের মুখের দিকে একনজর তাকাইয়াই চোখ নীচু করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সত্যপ্রিয় প্রচণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ছেলেবেলা থেকে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ঘটলে তো এরকম হবেই। কত ছেলে যে এমনি করে' আত্মহত্যা করছে! তাদেরি বা দোষ কি, সব শিক্ষার-দোষ। মা বাপ যদি না খেয়াল রাখে, তারা ছেলেমানুষ, তাদের কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে যে ভবিষ্যৎ ভেবে নিজেদের সাম্‌লে চলবে! কি বলেন ডাক্তার বাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈকি।'

ছেলেটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আজ আসি ডাক্তার বাবু।' বুঝা গেল, পালানোর জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'বোসো একটু, তোমার ঘুমের জন্য একটা কথা বলে' দিই। ওষুধের চেয়ে এতে তোমার বেশী কাজ হবে। শোয়ার আগে এক কাজ করবে. মেঝেতে জোড়াসন হয়ে মেরুদণ্ড সিধা করে' বসবে। এইখানে তোমার নাভিগ্রন্থি আছে না, এখানে বাঁ হাত দিয়ে এই ভাবে আস্তে স্পর্শ করে' থাকবে—আঙুলগুলি যেন সোজা থাকে আর পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে, বুঝলে? ডান হাতটি এই ভাবে মাথার তালুতে রাখবে। তারপর চোখ বন্ধ করে' ভাববে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত জীবিত প্রাণী আছে সব ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে' নিও, কেউ যেন না আসে ঘরে। আর—'

ছেলেটি কাতরভাবে বলিল, 'আজ্ঞে, আমার ঘরে আমার চারটি ভাই-বোন শোয়, আমার বাপ-মাও ওঘরে থাকেন। ঘরে সব সময় লোক থাকে।'

'অন্য ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে' নিও।'

'আরেকটা ঘরে দাদা-বৌদি শোয়। আর ঘর নেই আমাদের।'

ছেলেটি আর দাঁড়াইল না, একরকম পলাইয়া গেল। ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া সত্যপ্রিয় বলিল, 'এই সব অপদার্থ ছেলের জন্যই দেশটা রসাতলে গেল।'

ডাক্তার সায় দিয়া বলিল, 'নিশ্চয়।'

তারপর পরীক্ষা হইল যামিনীর। তাকে সঙ্গে করিয়া চটের পার্টিসনের ওপাশে গিয়া মিনিট পনেরো পরে আবার ডাক্তার ফিরিয়া আসিল। যামিনীর সুন্দর মুখখানা তখন টুকটুকে লাল হইয়া গিয়াছে। এদিকে আসিয়া সে ঘাড় নীচু করিয়া সত্যপ্রিয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'তুমি গাড়ীতে বোসো গিয়ে যামিনী। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলে' আসছি।'

যামিনীকে পরীক্ষা করিল অজানা অচেনা গরীব এক ডাক্তার কিন্তু চিকিৎসা আরম্ভ করিল সত্যপ্রিয়ের পরিচিত মস্ত নাম-করা কবিরাজ। যামিনীর জন্য নানা অনুপানের সঙ্গে পাথরের খলে কবিরাজী বড়ি পেষণ করা হইতে লাগিল, অনেকরকম সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা হইল।

ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা সত্যপ্রিয় সমস্তই মানিয়া নিল কিন্তু একটা বিষয়ে কবিরাজের সঙ্গে তার মতের মিল হইল না। চিকিৎসার সময়টা যোগমায়াকে আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে কবিরাজ ঘাড় নাড়িল।

'ভালর চেয়ে তাতে মন্দই বেশী হবে চক্কোত্তি মশায়।'

কিন্তু চিকিৎসকেরও সব কথা স্বীকার করা সত্যপ্রিয়ের পক্ষে অসম্ভব, এ-যুগের চিকিৎসকেরা কি জানে? জানিলেও সত্যপ্রিয়ের চেয়ে বেশী নিশ্চয় জানে না!

'ব্রহ্মচর্য্য পালন না করলে শুধু ওষুধ আর পথ্যে কি ফল হবে কব্‌রেজ মশায়?'

কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'স্বামীস্ত্রীকে গায়ের জোরে তফাৎ করে' দিলেই কি ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা হয়ে যায়? ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে না দিলে ফলটা খারাপ হবে।'

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কবিরাজ একটু ভাবিল, তারপর বলিল, 'তা ছাড়া, আমার মনে হয় সবটাই আপনার অনুমান, আপনার জামায়ের কোন চিকিৎসার দরকার ছিল না। শ্রীমানের স্বাস্থ্য তো এমন-কিছু খারাপ নয়! ওর মানসিক স্বাস্থ্যই বরং একটু খারাপ যাচ্ছে।'

'তা বলতে কি বুঝাচ্ছেন?'

'বুঝাছি যে শ্রীমানের মনটা একটু বিকারগ্রস্থ, কোন আঘাতটাঘাত পেয়েছে মনে কিম্বা অনেকদিন থেকে কোন দুঃখকষ্ট সহ্য করে' আসছে। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা না করে' খুব হৈ-চৈ ফূর্ত্তি করে' দিন কাটাবার ব্যবস্থা করলেই বোধহয় ভাল হ'ত।'

'হৈ-চৈ ফূর্ত্তিটা কি রকম?'

'এই মনের আনন্দে থাকা আর কি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হাসিতামাসা করা, খেলাধূলা ভাল লাগলে তাই করা, দেশটেশ বেড়ানো, ভাল লাগলে শিকারটিকারে যাওয়া—কি জানেন, সবাইকার তো এক জিনিষ পছন্দ নয়, যার যেদিকে মন যায়। একেবারে মদটদ খেয়ে গোল্লায়

যাবার ব্যাপার যদি না হয়, বেশী বাঁধাবাঁধির চেয়ে অল্পবিস্তর অসংযমও ভাল। শ্রীমান বড় বেশী ভয়ে-ভাবনায় দিন কাটায়—'

'কিসের ভয় ভাবনা?'

সত্যপ্রিয়ের মুখ দেখিয়া কবিরাজ কথার মোড় ঘুরাইয়া নিল। যে চিকিৎসা চায় উপদেশ চায় না, তাকে যাচিয়া উপদেশ দিয়া লাভ কি!

কবিরাজের সঙ্গে আলোচনার কয়েকদিন পরেই সত্যপ্রিয় মেয়েকে দেশে পাঠানোর আয়োজন করে। দেশের বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন আছে। সত্যপ্রিয়ের এক পিসতুতো বোন স্বামী-পুত্র নিয়া অনেকদিন হয় এখানে বাস করিতেছিল, হঠাৎ তার দেশের বাড়ীতে গিয়া কিছুদিন বাস করিবার সখ জাগে। সত্যপ্রিয়ের ইঙ্গিতে অনেকের মনে অনেকরকম সখই জাগিয়া থাকে। ঠিক হয়, যোগমায়াও এদের সঙ্গে যাইবে।

প্রথমে যোগমায়া কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়, তারপর যখন বুঝিতে পারে তাকে দেশে পাঠানোর ইচ্ছাটা সত্যপ্রিয়ের, তখন সে মুখ ভার করিয়া বলে, 'না বাবা, আমি এখন কোথাও যাব না।'

সত্যপ্রিয় বলে, 'ক'দিন বেড়িয়ে আয়। বিয়ের পর দেশের সবাই তোকে দেখতে চাচ্ছে।'

শুনিয়া যোগমায়া আর আপত্তি করে না। মেয়ে-জামাইকে দেশের আত্মীয়স্বজনকে দেখাইবার ইচ্ছা যদি সত্যপ্রিয়ের হইয়া থাকে, সে তো ভাল কথা। স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বত্র যাইতেই সে রাজী আছে।

'দুশো টাকা দেবে বাবা আমায়?'

'বিয়ের পর তুই যে হরদম টাকা নিচ্ছিস!—কি করবি টাকা দিয়ে?'

'নতুন রকম একটা গয়না কিনব। আজকেই দাও বাবা—আজকেই কিনব।'

বিবাহের পর বাপের ভয়টা যেন যোগমায়ার একটু কমিয়াছে—সব মেয়েরই কমে। বিবাহের পর খুব কড়া মেজাজের বাপও মেয়ের সঙ্গে একটু খুসী মেজাজেই মেলামেশা করে, মেয়েকে কিছু স্বাধীনতা দেয়। বাপ ও মেয়ের মধ্যে অতিরিক্ত একটা সম্পর্ক যেন কোথা হইতে কি ভাবে গড়িয়া ওঠে।

কিন্তু যোগমায়া যখন টের পায় তাকে একাই যাইতে হইবে, যামিনী সঙ্গে যাইবে না, তখন সে হঠাৎ বাঁকিয়া বসে। না, তার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না, সে যাইবে না। শরীরটা ভাল নয় তার। কি হইয়াছে? এই গা ম্যাজ-ম্যাজ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, আরও অনেক কিছু হইয়াছে।

সন্তানের এ রকম মুখোমুখি অবাধ্যতার অভিজ্ঞতা সত্যপ্রিয়ের জীবনে এই প্রথম। প্রথমটা সে কেমন থতমত খাইয়া যায়। তারপর ক্রোধে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে থাকে।

পিসতুতো বোন বলে, 'কি করব দাদা, যাব? মায়া তো কিছুতে যেতে রাজী নয়। যামিনীর এমন অসুখের সময় ওকে ফেলে কোথাও যেতে চায় না।'

'তোমাদের সকলের মাথায় গোবর ভরা।'

নিজের দোষটা বুঝিতে না পারিলেও পিসতুতো বোন মন্তব্যটায় সায় দিয়া চুপ করিয়া থাকে।

দিন তিনেক পরে সত্যপ্রিয় জামাইকে তার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলে, 'যামিনী।'

যামিনী বলে, 'আজ্ঞে?'

'তোমার ভালর জন্যেই বলা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জীবনে উন্নতি করতে হ'লে অভিজ্ঞতা চাই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমাদের দিল্লী ব্র্যাঞ্চের সাব-ম্যানেজার ক'মাসের ছুটি নিয়েছে। তার জায়গায় তুমি গিয়ে কাজ করে' আসতে পারবে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব বৈকি।'

ক্রুদ্ধ আহত মনে যামিনীর বিনয়ে একটু শান্তি বোধ হয়। নিজের মেয়ের চেয়ে পরের ছেলেই ভাল। শ্বেত পাথরের মেঝেতেই দুজনে বসিয়াছিল, যামিনী ঘাড় নীচু করিয়া উসখুস করিতে থাকে। কি যেন বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না।

'কবে যাব?'

'কালকেই রওনা হয়ে যাও। নিয়ম মত ওষুধপত্র খেয়ো। কব্‌রেজ মশায়কে বলে' দেব, তাকে ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন। আর সকাল-সন্ধ্যায় একটু যে যোগাভ্যাস শিখিয়ে দিয়েছি—'

'আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।'

সত্যপ্রিয় হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। কতগুলি বিষয়ে বুদ্ধিটা তার খুবই ধারাল, হঠাৎ তার মনে হয় জামায়ের সম্বন্ধে একটা নূতন তথ্য যেন আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে।

'কত টাকা?'

'পাচ শো।'

খুব লজ্জার সঙ্গে ভয়ে-ভয়েই যামিনী টাকার আবেদন জানাইয়াছে, তবু সত্যপ্রিয়ের মনে হয় মাঝে মাঝে দু'একজন তাকে ফাঁদে ফেলিয়া যেভাবে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে, যামিনীর টাকার দাবীটা যেন কতকটা সেই ধরণের। আপিসে নামমাত্র কাজের জন্য হাতখরচ বাবদ যামিনীকে মাসে মাসে দু'শো টাকা দেওয়া হয়। তার খরচ কি যে দুশো টাকাতেও কুলায় না? গম্ভীর হইয়া সত্যপ্রিয় একটু ভাবে, তারপর চেক বই বাহির করিয়া পাচশো টাকার একটা চেক লিখিয়া দেয়।

সারাটা দিন তার কেবলি মনে হইতে থাকে, চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি করিতে করিতে হঠাৎ যেন দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতাভরা শান্তির শান্তভাব।

যামিনী দিল্লী রওনা হইয়া যায় আর অত দূরে অসুস্থ স্বামীকে কাজ করিতে পাঠানোর জন্য বাপের উপর রাগ করিয়া যোগমায়া বাড়ীর সকলের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দেয়। শুনিয়া সত্যপ্রিয় নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, সকলে কি অকৃতজ্ঞ! যার ভালর জন্য যা করি তাতেই তার রাগ হয়।

মাস দুই পরে পিসতুতো বোন একদিন সত্যপ্রিয়কে একটা খবর দেয়। শুনিয়া প্রথমটা সত্যপ্রিয় বিশ্বাস করিতেই চায় না।

'কা'র ছেলে হবে?'

'মায়ার। এই চার মাস।'

সংবাদটা এমন ধাপছাড়া মনে হয় যে সত্যপ্রিয় তবু বোকার মত আবার জিজ্ঞাসা করে, 'ভুল হয়নি তো তোমাদের?'

দিল্লীর সাব-ম্যানেজার তিন মাসের ছুটি নিয়াছিল। যামিনী তিনমাস কাজ করিবার জন্য সেখানে গিয়াছে। দু'চারদিনের মধ্যেই তাকে সেখানে স্থায়ী করার নির্দেশপত্র পাঠানোর কথাটা সত্যপ্রিয় ভাবিতেছিল। এবার একেবারে চুপ করিয়া যায়। সহজে সত্যপ্রিয় লজ্জা পায় না, হঠাৎ যেন মেয়ের কাছে মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করিতে থাকে। কেবল মেয়ের কাছে নয়, আরো অনেকের কাছে। জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া সত্যপ্রিয় অনেক ব্যাপারে বাহাদুরী করিয়াছে, এমন অনেক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে যে-সব ব্যাপারের দিকে তার তাকানোই উচিত ছিল না, কিন্তু কারো কাছে কোনদিন এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করে নাই। মনে মনে বরং গর্বই অনুভব করিয়াছে। কিন্তু মেয়ে আর জামাইয়ের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়া এত বড় একটা ভুল করার জন্য সঙ্কোচ বোধ না করার ক্ষমতা সত্যপ্রিয়েরও নাই।

ছি, কি কদর্য্য ভুল!

মাসখানেক পরে যামিনী ফিরিয়া আসিল। শোনা গেল, যোগমায়ার মুখে নাকি হাসি ফুটিয়াছে।

দিন পনের পরে একদিন সকালে যামিনী মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সত্যপ্রিয়ের কাছে শ'তিনেক টাকা চাহিল। তার বিশেষ দরকার।

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোমায় পাঁচশো টাকা দিয়েছি যামিনী।'

সন্ধ্যার পর যোগমায়া আসিয়া আব্দার করিয়া বলিল, 'আমায় তিনশো টাকা দেবে বাবা?'

সত্যপ্রিয় বলিল, 'সেদিন তোকে দুশো টাকা দিয়েছি মায়া।'

পরদিন শোনা গেল, যোগমায়ার মুখ নাকি কালো হইয়া গিয়াছে। চোখ দেখিয়া বুঝা গেল, রাত্রে খুব কাঁদিয়াছে। ঘুম ভাঙার পর হইতে যামিনীর আপিস যাওয়া পর্য্যন্ত একবার ধারে-কাছেও ঘেঁষিল না দেখিয়া বুঝা গেল, দু'জনে ঝগড়া হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর মেয়েকে ডাকিয়া সত্যপ্রিয় তিনশ' টাকার একখানা চেক তার হাতে দিল। যোগমায়া নীরবে চেক হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

আপিসে সেদিন একজন লোক সত্যপ্রিয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। মহীতোষ তার কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার নিয়াছিল, যতদিন পারে অপেক্ষা করিয়া একেবারে শেষদিন লোকটি অগত্যা সত্যপ্রিয়ের কাছে আসিয়াছে।

অন্ধকার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া সত্যপ্রিয় ভাবিতে থাকে। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতির সমস্যার কথা নয়। অন্য কথা।

বুদ্ধিটা সত্যপ্রিয়ের সত্যই তীক্ষ্ণ। তবু কতগুলি ব্যাপারে মানুষের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুঝিবার কাজে লাগে কিন্তু মানুষ বুঝিতে চায় না। সত্যপ্রিয় জানে, একই মানুষের মধ্যে এরকম সমাবেশ ঘটে না, তবু সে আশা করে গরীব মা-বাপকে পাঠানোর জন্য জামাই তার যদিও বা যোগমায়াকে কষ্ট দিয়া তার কাছে টাকা আদায় করার উপায়টা অবলম্বন করিয়াছে, মানুষটা সে আসলে ভাল, মনটা তার নিশ্চয় নরম, টাকার ব্যবস্থার জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণেই তার মেয়েকে সে কষ্ট দেয় না। যামিনী যে মা-বাপকে পাঠানোর জন্য টাকা আদায় করে সপ্রতি এটা সত্যপ্রিয় টের পাইয়াছে।

টাকা আদায় করিবার উপায় থাকিলে, তা সে স্ত্রীর উপর চাপ দিয়াই হোক আর যে ভাবেই হোক, টাকা আদায় করাকে সত্যপ্রিয় বিশেষ সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বলিয়া মনে করে না, খুব বেশী অন্যায় বলিয়াও মনে করে না। যত মানুষকে সে চেনে তারা টাকা টাকা করিয়াই পাগল। তাই নিয়ম সংসারে। কেবল নিজের মেয়ে জামায়ের ব্যাপার বলিয়াই তার একটু খারাপ লাগিতেছে।

নরনারীর সম্পর্কে যে মনের মিল বলিয়া একটা খুব বড় রকমের ব্যাপার আছে, সোজা-সুজি অবিচার অত্যাচার না করিয়া, এমন কি রীতিমত ভাল ব্যবহার করিয়াও যে একজন আরেকজনকে অবহেলা করিতে পারে, মিষ্টি ভদ্রতার সম্পর্ক আর স্নেহ মমতার সম্পর্কের মধ্যে যে তফাৎ অনেক, সত্যপ্রিয় তা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। পৌরুষসম্পন্ন পুরুষ যদি অকারণে মেয়ে-মানুষকে মারধোর গালাগালি না করে, তবে আর মেয়েমানুষের সুখের জন্য কি দরকার হইতে পারে সে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যোগমায়ার অসুখী মন নানা দিক দিয়া নানাভাবে আসিয়া তাকে আঘাত করে। সাধারণ অবস্থায় হয়তো সে খেয়ালও করিত না, কিন্তু এদিকে এখন তার মন গিয়াছে। স্বাধীনতা চাহিলে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না বরং স্বাধীনতা না চাহিলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় এই সমস্তার মত, কন্যার বিবাহিত জীবনটাও তার কাছে এখন একটা সমস্যা। মেয়ে যে অসুখী হইয়াছে এর চেয়ে তার যেন বেশী যন্ত্রণা বোধ হয়, সে মেয়েকে সুখী করিবার জন্য নিজে পাত্র ঠিক করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, অথচ মেয়ে অসুখী হইয়াছে। ব্যবসার একটা সমস্যার মত ব্যাপারটাকে ভাবিতে গিয়া দু'চার দিনের মধ্যেই খুব ভাল একটি সমাধান তার মনের মধ্যে আসিয়া হাজির হয়। ব্যাপারটা তো মূলতঃ এই। মেয়েকে সুখী করার ভার সে জামায়ের উপর দিয়াছে এবং সেজন্য খরচ করিয়াছে অনেক টাকা। তার মেয়েকে সুখী করার দায়িত্বটা জামায়ের। জামাই যদি কাজটা না পারিয়া থাকে, তাকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার দায়িত্বটা সে পালন করিতে পারে নাই। সেই সঙ্গে এটাও বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, দায়িত্বটা ভালভাবে পালন না করিলে তার নিজের অবস্থাটাও সুবিধা দাঁড়াইবে না। অনেক কর্ম্মচারী আর এজেন্টের ভোঁতা বুদ্ধিতে এই জ্ঞানটুকু ঢুকাইয়া দিয়া অনেক দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কাজ সে করাইয়া নিয়াছে।

এই সহজ কথাটা এতদিন কেন মনে হয় নাই ভাবিয়া সত্যপ্রিয় একটু অবাক হইয়া যায়। একদিন যামিনীকে ডাকিয়া বলে, 'বাবা, তোমার মনের অবস্থাটা বড় খারাপ দেখছি। তোমার মুখ দেখে যোগমায়ার মুখখানাও সব সময় শুকিয়ে থাকে।' তা তুমি এক কাজ কর, ক'দিন বাপমা'র কাছে থেকে এসো গে। আজকেই চলে' যাও, এইবেলা, এইমাত্র—জিনিষপত্র থাক্।'

যামিনী একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, 'আজ্ঞে, আমার মনের অবস্থা—'

'পথের খরচ বাবদ এই চারটাকা দিলাম—গাড়ীভাড়া তিনটাকা চোদ্দ পয়সা, নয়? মন সুস্থ না করে' মানে, মনের অবস্থা না বদ্‌লে এসো না।'

এক ঘণ্টার মধ্যে জামাই বিদায় হইয়া গেল।

জামাইকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল ভাবিতে গিয়া সকলে কূল কিনারা পায় না, ভাবে, ভিতরে কিছু আছে। কোন কাজে যামিনীকে পাঠানো হইয়াছে, কোন উদ্দেশ্যে। সত্যপ্রিয়ের অদ্ভুত কাজ আর উদ্দেশ্যের তো অন্ত নাই।

কিন্তু কাজটা কি? কি সত্যপ্রিয়ের উদ্দেশ্য?

রওনা হওয়ার সময় সত্যপ্রিয় তাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমায় কেন পাঠিয়ে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছ তো বাবাজী?'

'আজ্ঞে না, ঠিকমত—'

এত করিয়াও যদি না বুঝানো গিয়া থাকে তবে আর এই অপদার্থের কাছে কি আশা করা যায়! সত্যপ্রিয় বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়।

'বুঝতে পারলে লিখে জানিও। আমি সঙ্গে-সঙ্গে সব ব্যবস্থা করব ফিরে আসার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানাব বৈ কি, নিশ্চয়।'

যামিনী চলিয়া গেলে সত্যপ্রিয় ভাবে, মাসে মাসে এতগুলি টাকা হাতে পাইয়া আর এমন আরাম ও উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইয়া গিয়া টাকা আর আরামের অভাবটাও যদি সেখানে তাকে আসল ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতে না পারে, তবে আর কিছু না বুঝাইলেও চলিবে।

তবু, কয়েকদিন পরেই সে যামিনীর কাছে একখানা পত্র পাঠাইয়া দেয়। জামায়ের কাছে এরকম কবিত্বপূর্ণ পত্র লেখা সত্যপ্রিয়ের মত মানুষের পক্ষে শুধু নয়, অনেকের পক্ষেই উদ্ভট আর খাপছাড়া। সত্যপ্রিয়ের পত্রের মর্ম্ম এই যে, বিবাহের পর হইতে মেয়ের মুখ তার বিষণ্ণ, যাই হোক, এবার যামিনী ফিরিয়া আসিবার পর বোধ হয় তার মুখে হাসি ফুটিবে: অন্ততঃ যামিনী যে হাসি ফুটাইবে তাতে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

বাসনা

জীবনানন্দ দাশ

পিঙ্গল রাস্তার 'পরে এখন নেমেছে রাত্রি
সফেন আলোর মেঘে অপরূপ সঙ্গীতের ধ্বনি :
ভিখিরী তাকায়ে দেখে সমস্বরে মানুষেরা গেয়ে যায়—
তাদের চোখের তারার কালো মণি
বেগুনি সিন্ধুর পার ঘিরে যেন জ্ব'লে যায়
মানুষের পৃথিবীর অন্তিম আরণি।

মাথায় গাধার টুপি এঁটে নিয়ে জামার বেলুনে
নেচে যায় ছিপ্‌ছিপে বহুতর নগরীর ভাঁড়।
বসন্তের জ্যোৎস্না : মোম;—সুদীর্ঘ বালিকা সব
প্রতিধ্বনিময়, দক্ষ ফুটপাতে হ'ল একাকার।
জাহাজ এসেছে এক জলপাইধূম্র সমুদ্রের থেকে উঠে,
মাস্তুলের মুণ্ড তার রক্তিম চাঁদের শিং ধ'রেছে এবার।

এই শতাব্দীর থেকে—ভিখিরী দেখেছে চেয়ে
এই সব সুরের রিরংসা ভেসে চ'লে যায় বিভিন্ন শতকে।
ঢের আগে দার্শনিক দেখেছিল এই সব বিষয়ের যাত্রীদের
দর্পণের মত তার নখে।
তারপর সব কোলাহল স্তব্ধ।
একটি কুকুর শুধু রাস্তায়—নমুখকে বকে।

ভিখিরীর শতছিন্ন আলখাল্লা ভারতীয় প্রবাদের;
হয়তো বা হারুণ-অল-রশিদের কৌতুকের মত;
যেইখানে জামা ছিঁড়ে জ্যামিতিক হাড়গুলো দেখা যায়
সেখানে সে কমলা রঙের তালি বানাতে নিরত।
আশীর্ব্বাদ করি যারা জীবনের সাধে বেঁচে ঢের পায়
অধিক প্রগলভতর হর্ষে কারা হয়েছে নিহত।

পরিস্থিতি

সমর সেন

জয় হ'ল মিলিত পৃষ্ঠদেশের।
পশ্চিমে ভদ্রজন বিপন্ন, নিশ্চিন্ত ত্বয়ারে
বিত্যুৎগতি বর্বর তাতার বর্শা হানে ;
শোনা যায়
মন্দির মস্‌জিদ গির্জায় শোনা যায় উচ্চকিত আর্তস্বর,
ঐক্যতান, কুরুক্ষেত্রে পুরুষবিলাপ।
এদিকে তাই দেশরক্ষায় বিপ্লবী নেতা হঠাৎ তৎপর,
ফলে, উচ্ছ্বসিত ভারতবন্ধু ;
ধামাধরায় তক্লান্ত, নব্য বলশেভিক সাঙ্গপাঙ্গ
পার্শ্বচর আস্ফালনে মুখর ;
এপ্রিলে যে সংগ্রাম সুরু, এ্যাসেম্‌ব্লি হলে হবে শেষ,
এ হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি লেগে
ঝল্‌মল্‌ করে অনেক পার্টির চিত্ত।

অলীক স্বর্গ থেকে এতোদিন পরে নেমে আসা !
স্মরণে আসে, বর্ণহীন সহরে দেখা
রক্তবর্ণ ফুল,
সম্ভবত কৃষ্ণচূড়া ;
আকাশে মেঘের মৃদঙ,
ভারতের ভাগ্যাকাশে
অন্ধকার স্তরে স্তরে জানিনা কী ঝড় ঘনায়।

এ অবস্থায় বৃন্দাবনী বাঁশী যদি চকিতে শুনি,
তাহ'লে বলবে লোকে : রোমান্টিক ভুঁইফোড়।
অত্যধিক পরিশ্রমে হাহুতাশ চাপি,

কেননা ব্যক্তিগত গান গাওয়া কর্তব্য নয় ;
যদিচ পৈতৃক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।

দিনে দিনে প্রতিপন্ন হয় আমাদের প্রয়োজন নেই
স্বাধীনতায়। কারণ, জর্মান আমলে সকলি মায়া।
সংসারকে তুড়ি মারি ; একমাত্র ভয়—
মেঘদূতী বিমান যদি বজ্র হানে ?
অধুনা বর্ষায় ঈষত্বষ্ণ শরীর ;
পকেট শূন্য। শূন্য চারিধার।

সংঘাত

অরুণকুমার মিত্র

কঙ্কাল-মুঠি বাড়াও !
বিকৃত দ্বিধা—দাবানলে দ্যাখো
অরণ্য যায় পুড়ে।
পাতা-ঝরা গান নেই আর হাওয়া জুড়ে।

চোখের মণিতে সে মরীচিকার ছায়া
মোছেনি কাঁকর বিঁধে ?
মায়াবী সূর্য্য বিকল নভশ্চর।
এতদিনকার বিষন্ন হাসি
এবার অবান্তর।

হাড়ের ভেল্কি লাগুক বিসংবাদে।

পৌনপুনিক

বিরাম মুখোপাধ্যায়

ধমনীর তৃষ্ণা শেষ। চক্রবালে শান্ত ইন্দ্রধনু—
বর্বর পৌরুষ হ'তে অরাজক অগ্নির বিচ্ছেদ।
জানিলাম এই শান্তি।
এই শান্তি অগাধ অপার —
আর
জীবন মসৃণ; পলে-পলে
আত্মিক স্বাস্থ্যের কান্তি, সভ্যতার প্রবুদ্ধ প্রগতি।
জানিলাম এই শান্তি অগাধ, অপার।

অলক্ষ্যে ভ্রূকুটি হানে বৃদ্ধ মহাকাল···

তারপর
ইতিহাসে বর্ণচোরা দিন।
সময়ের ধূলো লেগে শুভ্র শান্তি কুটিল, কঠিন।
তারপর সূক্ষ্মস্বার্থ বজ্রমুষ্টি তোলে;
ছদ্মবেশী রক্তসন্ধ্যা দোলে
জাদুবুদ্ধি বিজ্ঞানীর নখর-বিদ্যুতে।
বন্দরের কৃষ্ণমেঘ
সুস্থ চিত্তে হানা দেয়, রক্তে তৃষ্ণা আনে।
মহাকাল মনে রাখে পুরাতন ঋণ,
ইতিহাস বাঁকাহাসি হাসে।

সভ্য চিত্তে তবু শান্তি চাই
—সৌম্য শান্তি, শুভ্র, অব্যাহত।
অর্থনীতি তাই আজো পুরানো জাবর কাটে,
জের টানে—সনাতন সঙ্কটের জের;
বন্দরের কালো মেঘে উদ্ধত ইঙ্গিত—
লৌহ আর ইস্পাতের জলন্ত ফলক
সমাধান-উদ্যত, চঞ্চল।
ইতিহাসে রক্ত-ঝরা দিন—
সভ্য চিত্তে তবু শান্তি চাই
—সৌম্য শান্তি, শুভ্র, অব্যাহত।

জীবনের স্বাদ আজ রক্ত-ঝরা দিনে।
ইতিহাস জানে
সভ্যতার মানচিত্রে করুণ আগুন,
অনিবার্য নগ্ন অগ্নিবাণ।
ক্লান্ত হাঁটু তাই সিঁড়ি ভাঙে;
বার-বার মাথা ঠুকে যায়
শুধু এক রহস্যের দুর্ভেদ্য দেয়ালে।
তাই জীর্ণ সাম্য-মৈত্রী-সমাধির 'পরে
খরশান শান্তির স্বস্তিক।
মহাকাল সব মনে রাখে।

সভ্য চিত্তে এই শান্তি।
ইতিহাস জানে
ভস্মতলে দাবাগ্নির ঘুম।
এই শান্তি শুভ্র, অব্যাহত
হৃদয়ে হীরক জ্বলে
সভ্যতার রক্ত-ঝরা দিনে।

প্রান্তর

রজত সেন

শাল আর মহুয়া গাছের শাখায় পিছ্‌লে পড়ছে সূর্য্যের নরম, সোনালি আভা। কাল শেষ-রাত্রেও এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে ছেঁড়া মেঘ, সকালের এলোমেলো বাতাস।

জানলার কাছে ইজেলের উপর প্রায়-সমাপ্ত একটি যুবতীর মুখের খানিকটা বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় ধুয়ে গেছে, রঙটা তখনও কাঁচা ছিলো। কোমর থেকে নিম্নগামী জলের রেখাগুলো আবরণের আভাষ দিচ্ছে। ইজি-চেয়ারে ঘুমন্ত সুধাংশুর মাথাটা হেলে পড়েছে এক পাশে, হাতলের ওপর এলায়িত দু'খানি হাত, পা দুটো ছড়ানো সামনে আর একখানি চেয়ারে। বাঁ ধারে টিপয়-এর ওপর এ্যাস্-ট্রের চারধারে ছড়ানো সিগারেটের টুকরো।

শেষরাত্রে যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলো তখনও তার চোখে ঘুম নেই। জানলার বাইরে মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের একটানা সোঁ সোঁ শব্দ আর অবিশ্রাম ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি।

চেয়ারটায় শুয়ে শুয়ে সুধাংশু বুঝতে পারছে বৃষ্টির ছাঁটে ভেসে যাচ্ছে ঘর, জিনিষপত্র সব যাচ্ছে ভিজে, কিন্তু তবু তার এক বারও ইচ্ছে হ'লনা উঠে জানলাগুলো বন্ধ করে। কি হবে কাঁচের সামান্য কয়েকটা শার্শি এঁটে দিয়ে? কি আর তেমন আছে যে বৃষ্টির জলে নষ্ট হতে পারে!

কিন্তু ছবিটা—

বর্ষার শেষ সমারোহ দেখতে দেখতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

অস্বস্তিকর অবস্থায় ঘাড়টা তার যন্ত্রণায় কন্-কন্ করে' উঠলো। চোখ মেলে সে সোজা হয়ে বসলো। ভোরবেলার সূর্য্যালোক ঝলমল করছে চারদিকে। আকাশে নিরুদ্দেশ সাদা মেঘের মিছিল! প্রথমেই চোখ পড়লো তার ইজেলের ক্যানভাসটার দিকে; হাত বাড়িয়ে টিন থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুধাংশু কয়েক মিনিট নিঃশব্দে টানবার পর ধীরে ধীরে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো, ছোট কম্পাউণ্ড-এর সীমানার মেহেদী বেড়ার পাশ দিয়ে কাছারী রোড একেবারে মোরাবাদী পাহাড়ের নিচে গিয়ে থেমেছে। দু'ধারে ঝাউগাছ চলে' গেছে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ পর্য্যন্ত, তার পর চাঁপা বন। নির্জ্জন নিস্তব্ধ পথ এতক্ষণে বোধ ফুলের গন্ধে সুরভিত হয়ে উঠেছে। ছবিটার দিকে সে তাকালে—প্রথমে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে; তারপর তার চোখে ফুটে উঠলো একাগ্রতা, বিস্ময়; এখনও চেনা যায় মুখখানা। ঝাপসা রঙ-এর অন্তরালে কখন ছবির চোখ দুটো স্পষ্ট আর জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আরও কয়েক পা এগিয়ে এলো সে; অস্পষ্ট, চাপা কণ্ঠে রূপালী হাসির তরঙ্গ, বুক আর গলার মাঝখানে ছোট একটি কালো তিল, বাঁকা ঠোঁট দুখানিতে মৃদু হাসির আভাষ, হাতের দীর্ঘ সরু আঙুল; ঈষৎ আনমিত স্তন—সুধাংশু সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্র পায়ে দেয়ালে-ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের

দিকে এগিয়ে গেল. তার চোখের ওপর চৌকো ঘরে দুটি নীল অক্ষর পৃথিবীর সব কিছু ম্লান করে' দিলে; সতেরোই। আজ পনেরোই জুন, মাঝখানে সংক্ষিপ্ত জীবনের কয়েকটি ঘণ্টা মাত্র। এক আর সাত, দু'টি অক্ষর তার চোখের সামনে বৃহৎ হয়ে উঠলো, জীবন্ত হয়ে তারা একটা বাড়ীকে বেষ্টন করে' মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে, আফ্রিকার কোন গহন বনের প্রান্ত থেকে ভেসে এলো বাঁশি আর দামামার শব্দ! অনেক ফুলের গন্ধ! অনেক কোলাহল, তরুণ আর তরুণীর উচ্ছ্বসিত উদ্দাম কোলাহল। চুল আর রজনীগন্ধার গন্ধে সুধাংশুর নিশ্বাস বুঝি ভারি হয়ে এলো।

দুপুরের দিকে আবার আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল, ঝাউ গাছের শাখায় সুরু হ'ল বাতাসের পাগলামি। সুধাংশু তাকিয়ে ছিলো ক্যালেণ্ডারের দিকে! সিগারেটের নীল ধোঁয়া ক্রমশঃ হালকা হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ ও উঠে গিয়ে ক্যালেণ্ডারটা ছুড়ে দিলে জানলা দিয়ে, একটা দমকা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল রাস্তায়। সুধাংশু আর একটা সিগারেট ধরালে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। চাকরটা কখন নিঃশব্দে এসে টেব্‌লের ওপর হ্যারিকেন লণ্ঠন জালিয়ে দিয়ে গেছে। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে; ঠাণ্ডা, ভিজে বাতাসের উৎপাত কমেনি এখনও। সন্ধ্যের পর সে প্রায়ই ক্লাবে যায়। সেখানে অন্যান্য ভদ্রলোকরা অপেক্ষা করে তার জন্যে। কিন্তু আজ আর উৎসাহ নেই, লোকের কোলাহল আজ আর ভালো লাগবে না। অন্ধকারে চুপচাপ তার চাইতে বসে' থাক, বাতাসের শব্দ শোনো, বা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাক জানলার কাছে, ছেঁড়া মেঘের আড়ালে চাঁদ দেখা দিতে পারে, বলা যায় না কিছু।

পৃথিবীতে অনেক-কিছুতেই সে বাধা পেয়েছে, যৌবনের আরম্ভ থেকেই; চাঁদ দেখায় অন্ততঃ কেউ তাকে বাধা দিতে আসবে না, চাঁদ তার নিজের। শুধু বাধা আর অনুযোগের প্রাবল্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা এসে দাঁড়িয়েছিলো যৎসামান্য ইচ্ছায়, কিন্তু তাঁও তাকে একদিন বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। সুধাংশু আর অনর্থক অপেক্ষা করে' থাকেনি, লাভ ছিলো না কিছু। পরিখা আর পরিধির অনেক দূরে সে স্থান নির্ব্বাচন করেছিলো, সেখানেও তার মনোরথ বিফল। হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে অনেক অনেক দিন পর্য্যন্ত; প্রসারিত হাতের আকর্ষণ কখন ছিন্ন হয়েছে সে জানতে পারেনি।

তোমার যদি গ্রহণ করবার সাহস না থাকে তুমি পাবে না, পেলেনা। না-পাওয়াটাই সর্ব্বস্ব হয়ে থাকবে তোমার জীবনে; যদি পাও—সে তোমারই। তুষ্ট করলে সবাইকে, কিন্তু তোমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রইলো আমরণ অসন্তোষ। জীবনের শেষ হিসাব-নিকাশের সময় এলে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করবার অবসর হয়। তখন শুধু কানের কাছে বাজবে—যা পেতাম তা পেলাম না, শুধু অপরের ইচ্ছা আর সংস্কারকে দিলাম আধিপত্যের সুযোগ, নিজেকে করলাম বঞ্চিত। তাদের ক্ষতি নেই কোনো, ক্ষতি আমারই।

সুধাংশু অন্ধকারে ভিজে এলোমেলো বাতাসের মধ্যে রাস্তায় এসে পড়লো। কয়েক বার চেষ্টা করলে সিগারেট ধরাবার, আগুন নিবে গেল। পিচ-বাঁধানো কালো রাস্তার ওপর গ্যাসের পাণ্ডুর আলো চিকচিক করছে, বৃষ্টির জলে চিম্‌নীগুলো ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ পথ, মাঝে মাঝে দু'একখানি বাংলোর জানলা দিয়ে দেখা যায় স্তিমিত আলো। সুধাংশু পা চালালে, আর বাড়ী নেই, দুধারে ফাঁকা মাঠ। আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সে, সহর পড়ে' রইলো পেছনে। এখানে প্রাণের কোন আভাষ নেই, চারপাশে শুধু ঘন অন্ধকার। সামনেই কয়েক হাত দূরে যে চাঁপা গাছটা দেখা যাচ্ছে তার নিচে এসে সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো। এই সেই গাছ, যে-গাছের নিচে একদিন—

সুধাংশু ফেরবার পথে পা বাড়ালে।

সে যখন বাড়ী ফিরলে তখনও তার ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জলছিলো। অস্পষ্ট, পাণ্ডুর আলোর কয়েকটি রেখা ঘরের কোণে রক্ষিত একটি ব্রঞ্জের ষ্ট্যাচুর ওপর পড়েছে। মূর্ত্তিটা একটি তরুণী মেয়ের; তার অর্দ্ধ-সমাপ্ত ছবিটা যার রূপ পরিগ্রহ করেছিলো বোধ হয় তারই।

ষ্ট্যাচুটার জন্যে এক ভদ্রলোক তাকে হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলো, বিক্রি করেনি সে, একটা মানুষের সম্পূর্ণ বিস্মৃতির মেয়াদ আর ক'টা দিন? থাক ওটা, থাক!

পরদিন পুরুলিয়ায় হাওড়ার গাড়ী বদল করবার সময় মুক্লিল বাধলো।

গাড়ী ছাড়বার মিনিট দুই বাকী, কুলিটা মাথায় মোট নিয়ে তারস্বরে তাগাদা দিচ্ছে, কিন্তু সে-শব্দ যেন তার কানে পৌঁছচ্ছে না।

না সে ফিরেই যাবে তার রাঁচীর বাংলোয়। সেখানকার নির্জ্জনতা, অন্ধকার রাত্রি, ঝাউ বন, শেষরাত্রির বাঁকা চাঁদ—নাঃ সে ফিরেই যাবে। কুলিকে আদেশ দিলে মাল নামিয়ে রাখবার। কুলিটা তার বাবুকে অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিলো, সে হেসে ফেললে, 'ক্যা বাবু, তবিয়ৎ ঠিক নেই?'

সুধাংশু জানালে তবিয়ৎ ঠিকই তার আছে। হোল্ড-অলের ওপর সে হাত পা ছড়িয়ে বসে' সিগারেট ধরালে। হাসিমুখে কুলিটার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলে, 'পিয়ো।'

প্রথমে আপত্তি জানিয়ে পরে সে সিগারেটটা নিলে।

শেষ হুইস্‌ল বেজে উঠলো, গার্ড তার নীল লণ্ঠনটা শূন্যে নাড়ছে। গাড়ীটা নড়ে উঠতেই সুধাংশু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কুলিটাকে ডাকলে মাল তুলে দিতে। কোনরকমে জানলা দিয়ে মালগুলো ভিতরে গলিয়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে গাড়ীতে উঠে পড়লো।

জানলা দিয়ে কুলিটার হাতে সে একটা আধুলি গুঁজে দিলে। বোকার মত কুলিটা সুধাংশুর দিকে তাকিয়ে রইলো।

পরদিন সকালে ছ'টা চল্লিশে গাড়ী হাওড়া পৌঁছালো।

এখন আর টালীগঞ্জে গিয়ে লাভ নেই। সে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো। সমস্ত দিন

সে আর বেরুলো না ঘর থেকে।

ঠিক সন্ধ্যের সময় হোল্ডঅল্ আর সুটকেসটা নিয়ে সে ট্যাক্সিতে চেপে বসলো।

টালীগঞ্জের এক জনবিরল রাস্তায় প্রকাণ্ড এক বাড়ীর সামনে সে ট্যাক্সি থামালে। সমস্ত বাড়ীটা নানা রং-এর ফ্লাড্-লাইট আলো দিয়ে রীতিমতো আলোকিত করা হয়েছে। সামনে প্রকাণ্ড লনটা বিচিত্র কাপড় দিয়ে আবৃত, লনের ওপর মূল্যবান কার্পেট, এক এক খানা গোল টেব্‌লের চারধারে কুশান-দেয়া চেয়ার, সুশোভিত পরিচ্ছদ ছেলে আর মেয়ে, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ কোন টেব্‌লের ধারে বসে' জটলা পাকাচ্ছে। রূপোর ফুলদানীতে রজনীগন্ধা আর লিলি। রেডিওতে বিলিতি অর্কেষ্ট্রা!

ছুটো মোটারের পাশ দিয়ে সে এক হাতে সুটকেস আর এক হাতে হোল্ডঅল্ নিয়ে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল। গেটের কাছেই বাড়ীর কর্ত্তা মৃগাঙ্কবাবু সম্মানীয় অতিথিদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলেন, পরণে তাঁর সিল্কের পাঞ্জাবী, পায়ে ভেলভেটের চটি, গ্রীস থেকে তাঁর এক বন্ধু পাঠিয়েছেন।

সুধাংশুর দীর্ঘ দেহ আর অত্যুজ্জ্বল মুখের সামনে তিনি আর একটি অতিথিকেও দেখতে পেলেন না যাঁকে লক্ষ্য করে' ছুটে যাওয়া যায়। মৃগাঙ্কবাবুর মুখখানা এক নিমেষে রক্তহীন, পাণ্ডুর আকৃতি ধারণ করলো। তবু কোন রকমে পলায়মান হাসিটাকে গ্রেপ্তার করে' তিনি মৃত-গলায় বললেন, 'এই যে! সুধাংশু! এসো, এসো, অনেকদিন তোমায় দেখিনি!'

'আজ্ঞে—'

মোট-ঘাট নামিয়ে রাখলে সে।

'তবে যে শুনলাম তুমি মাদ্রাজ আছো! সিঙ্গাপুরও গিয়েছিলে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ গিয়েছিলাম, মাস দুই হ'ল এসেছি, আমাদের রাঁচীর বাংলোয় ছিলাম।'

'দেখেছো কাণ্ড! এত কাছে ছিলে অথচ আমি কিছুই জানিনে, নেমন্তন্নটা পর্য্যন্ত করতে পারলাম না!'

'তাতে আর কি! আমায় আর কি নেমন্তন্ন—'

মৃগাঙ্কবাবু একটা চাকরকে হাঁক দিলেন সুধাংশুর জিনিষপত্র ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যে। 'খুব সুখী হলাম সুধাংশু, বুঝলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'যাও, হাত মুখ ধুয়ে সুস্থ হও, তোমার কিন্তু বিশ্রাম নেই, কাজে লেগে যেতে হবে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মৃগাঙ্কবাবু টেনে হাসতে লাগলেন, তাঁর জিয়তি হাসি।

সুধাংশু এগিয়ে গেল লনের দিকে।

কোথায়, কোন্ দিকে শানাই বাজছিলো, বাঁশীর আওয়াজ শুনে মৃগাঙ্কের মনে হ'ল লোকটা ওস্তাদ, কি একটা রাগিনী আলাপ করছিলো, ভারি চেনা, ভারি পুরোনো। হারানো দিনের অনেক কথা মনে করিয়ে দেয়।

খানিকটা দূরেই যে তিনটি সৌখিন যুবক বসে' গল্প করছিলো তাদের সঙ্গে সুধাংশুর অনেক দিনের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। সেদিকে এগিয়ে গেল। সে শুনতে পেলে কেউ বলছে, 'দেখেছো, Rascalটা ঠিক হাজির হয়েছে।'

'বলিনি আমি? শেষ পর্য্যন্ত আসবে।'

'কিন্তু কি আস্পর্দ্ধা দেখেছো, সরকার সাহেব দারোয়ান দিয়ে বা'র ক'রে দিলেই ত পারতেন।'

'না হে, দেবদাস পার্ব্বতীকে শেষ একবার দেখে যেতে এসেছে! ছদ্মবেশে যে আসেনি এই ঢের।'

উচ্চহাসি শোনা গেল।

সুধাংশু তাকালে সেদিকে। স্যাট্‌পরা ছটি যুবক! একজন পাইপ টানছিলো, আর একজনের হাতে আইসক্রীম। সুধাংশুকে তাকাতে দেখে তারা চুপ করলো।

তাকে দেখে টেব্‌লের তিনজনেই এক সঙ্গে উঠে পড়লো।

'আরে, সুধাংশু যে!'

'হ্যাঁ হে, আমিই।' সুধাংশু বললে, তবু কথা বলবার লোক সে এতক্ষণে পেয়েছে।

'তোমার কথাই আলোচনা করছিলাম।'

'আমার সৌভাগ্য, কিন্তু বিষয়টা কি?'

'তোমার সাহস আছে হে!' শিবরাম বললে, 'কিন্তু কেন এলে বল তো? এতদিন না এসে পারলে, আর একটা দিন—'

'নেমন্তন্ন খেতে আসতে দোষ কি?' সুধাংশু হাসছিলো।

'কিন্তু যদি অপমান করে?' মণিলাল বললে, তার গলায় উৎকণ্ঠা।

'পেট ভরা থাকলে গায়ে লাগে না!'

কয়েক মিনিটের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা।

'আশ্চর্য্য!' মণিলাল হঠাৎ বলে' উঠলো।

'আশ্চর্য্য কি হে? জানবার কৌতূহল হচ্ছে।'

আবার কয়েক-মুহূর্ত্তের বিরতি।

'আমরা ভেবেছিলাম—'

'তা হ'ল না দেখতেই ত পাচ্ছো?' বাধা দিয়ে সুধাংশু বললে।

'কিন্তু কেন তাই বল না?'

'আমি তার কি জানি?' সুধাংশুর গলায় নিস্পৃহতা।

'ছেলেটি নাকি আই-সি-এস, কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট।'

হঠাৎ ব্যাণ্ড বেজে উঠলো, অন্দরমহলে শাঁক আর উলুধ্বনি শোনা গেল চারিদিকে একটা ব্যস্ততা, বিশৃঙ্খলা। কয়েকটা চায়ের দামী পেয়ালা ভেঙে গেল, একখানা চেয়ার গেল উল্‌টে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে লন ফাঁকা। সুধাংশু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সিগারেটের কেস্‌টা বা'র করলে।

নিচে প্রকাণ্ড হলে বসবার জায়গা হয়েছে। সেখানেই ভীড় জমতে সুরু হয়েছে। দক্ষিণের জানলার উপরে তার নিজের আঁকা 'স্বপ্ন' বলে' প্রকাণ্ড ছবিখানা এখনও আছে কিনা কে জানে!

সিগারেটে কয়েকটা দীর্ঘ টান দিয়ে সুধাংশু টেব্‌লের ওপর পা দু'খানা তুলে দিলে। চোখ বুজে সে বোধ হয় তার নতুন ল্যাণ্ডস্‌কেপের পরিকল্পনাটা মনে-মনে ভেঁবে নিচ্ছিলো।

'দেখুন!'

সুধাংশু তাকালে ভদ্রলোকটির দিকে।

'কিছু মনে করবেন না, আমার ওপরেই শেষকালে এই অপ্রিয় দায়িত্ব চাপিয়েছেন ওঁরা।' ভদ্রলোক থামলেন, এ-বাড়ীর কোন আত্মীয়, সুধাংশু অনেকবার তাঁকে দেখেছে।

'বলে' ফেলুন, সঙ্কোচের কোন প্রয়োজন নেই।'

'আপনি আসাতে একটা বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, সবাই এ নিয়ে নানারকম কথা রটাচ্ছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে বরযাত্রীদের মধ্যেও জানাজানি হয়ে যাবে। একটা বিশ্রী বদনাম এমন দিনে! হয়তো বরের কানেও গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পৌছবে। আজকের দিনে একটা খারাপ ধারণা ওঁর মনে যদি বদ্ধমূল হয়—তা ছাড়া—'

সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে সুধাংশু দাঁড়ালে, বললে, 'আমার একটা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ আর একটা হোল্ডঅল বেয়ারা কোথায় রেখেছে যদি অনুগ্রহ করে' আনিয়ে দেন।'

'নিশ্চয়! নিশ্চয়!' ভদ্রলোক অন্তর্হিত হলেন।

সুধাংশু প্রকাণ্ড গেটটার এক পাশে এসে দাঁড়ালো।

রাস্তায় মোটর থামছে আর নিমন্ত্রিতেরা নামছে। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা। কয়েক মিনিটের ছেদ।

সে রাস্তার দিকে তাকালে। দু'ধারে সারি সারি গাড়ী।

'এই যে আপনার জিনিষ।' ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন। পেছনে একটা বেয়ারার হাতে তার জিনিষপত্র। 'দেখুন, যদি সামান্য কিছু মুখে দিয়ে যান যাবার আগে—এ আমার নিজের অনুরোধ।'

সুধাংশু একটু হেসে একহাতে হোল্ড্‌অল আর এক হাতে সুটকেস্‌টা নিয়ে বললে, 'আচ্ছা! নমস্কার।'

'নমস্কার।'

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সে বাঁয়ে একটা সরু নির্জ্জন রাস্তা নিলে, অনেক ব্যবধান রেখে এক একটা গ্যাসলাইট। দু'ধারে ঘন জঙ্গল, সহর এদিকে এখনও অনুন্নত। ঝিঁঝিঁ ডাকছে অবিশ্রাম, কেয়ার গন্ধটা সুধাংশু আজও ভোলেনি।

অট্টালিকার কোলাহল এত দূরে পৌছায় না, শুধু অস্পষ্ট শানাই-এর শব্দটা শোনা যাচ্ছে।

আর কয়েক মিনিট পরে তাও আর শোনা যাবে না।

'এই !' পেছন থেকে তাকে, হ্যাঁ তাকেই যেন কেউ ডাকলে।

সুধাংশুর বুকের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দুলে উঠলো। তার হৃদপিণ্ডে লাগলো উন্মাদ রক্তের একটা ধাক্কা। নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। সে ফিরে দাঁড়ালো, দূরে কেউ—একটি মেয়ে তার দিকে ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে আসছে, কে ? কুন্তী ? কুন্তী ?

গ্যাসলাইটের আলোয় সুধাংশু কুন্তীর মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলে, মুখে চন্দনের রেখা-চিত্র, খোঁপায় রজনীগন্ধা আর জুঁই। পরণে উজ্জ্বল কমলালেবু রঙের একখানি শাড়ী—যে-রংটা সব চাইতে তাকে মানায়।

সুধাংশু তার জিনিষপত্র নামিয়ে রাখলে মাটিতে, হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে।

অস্পষ্ট অন্ধকারে কুন্তীর দীর্ঘ দেহ আরও দীর্ঘ দেখাচ্ছিলো, দ্রুত পায়ে সে সুধাংশুর বুকের কাছে এসে দাড়ালো, দু'হাতে সে তাকে গুছিয়ে নিলে বুকের মধ্যে।

শানাই-এর শব্দটা এখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

কুন্তী নিজেকে মুক্ত করে' নিয়ে বললে, 'চল।'

'এসো।'

'ছবিটা কদ্দূর হ'ল ?' কুন্তী জিজ্ঞেস করলে।

'ছবির আর কি দরকার ?'

কুন্তী হাসলে, তার গলার নীচে কালো তিলটা গ্যাসলাইটের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ঝড়ের আকাশ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চোখ খুলে কৃষ্ণা গত রাত্রি এবং দিনের আনুপূর্ব্বিক ঘটনাকে মিলেয়ে দেখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লে; অস্পষ্ট কুয়াশায় আছন্ন মোহময় রাত্রি—দিনের প্রত্যক্ষ আলোয় মোহের অবকাশ নেই—মুহূর্ত্তে কৃষ্ণার মনের সব রঙ ধুয়ে-মুছে গেল।

সে সন্ত্রস্তভাবে উঠে বস্‌লো। অনেক আগে তার যাওয়া উচিত ছিল—পৃথিবী সজাগ হবার আগে। সব চেয়ে তার রাগ হ'লো জয়ন্তর ওপর। তার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের এ-রকম বেপরোয়া দুঃসাহস কেন !……

একটু আগে যদি সে চলে' আস্‌তো ! ভোর হবার আগে—হয়ত কেউই টের পেতনা। আর এখন ? নীচে কর্ম্মব্যস্ত হাতের খুট-খাট আওয়াজ কানে আস্‌চে··· খানসামাদের চোখের সাম্‌নে দিয়েই হয়ত তাকে নীচে নাম্‌তে হবে, তারপর সে সিঁড়িটাও ভাল ক'রে চেনে না···দিনের বেলায় ঠিক কর্‌তে কতক্ষণ লাগ্‌বে কে জানে ! এর মধ্যে যদি মিঃ দে'র সঙ্গেই দেখা হ'য়ে যায় !—দুশ্চিন্তায় কৃষ্ণার মুখ-চোখ শুকিয়ে এসেছে। মনে যথেষ্ট সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় ক'রে সে একবার দরজার কাছ পর্য্যন্ত যাচ্ছে আবার হতাশ হয়ে ফিরে আস্‌ছে। যদি কেউ দেখে ফেলে !

ক্রমে দিনের আলো আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো; এবার কৃষ্ণা জোর ক'রেই উঠে দাঁড়াল।

বারান্দায় এসেই তাকে থাম্‌তে হ'লো; সিঁড়িটা তখনও সে আবিষ্কার ক'রে উঠ্‌তে পারে নি।

মিসেস দে প্রায় একরকম মুখোমুখি দাঁড়ালেন, রুক্ষ কঠিন গলায় প্রশ্ন কর্‌লেন, 'তোমার নামই কৃষ্ণা, নয় ?'

মাটির দিকে চেয়ে কৃষ্ণা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো, কোন উত্তর দিতে পার্‌লে না।

'তুমি বোধ হয় জয়ন্তর সঙ্গেই পড়ো ?'—মিসেস দে'র দ্বিতীয় প্রশ্ন।

তবুও কৃষ্ণার সাহস হলোনা কথা বল্‌বার।

মিসেস দে আরও একটু রূঢ় গলায় বল্‌লেন, 'চুপ ক'রে থেকোনা, উত্তর দাও।'

অনেক কষ্টে এবার সে বল্‌তে পার্‌লে 'হ্যাঁ তাই। জয়ন্ত আর আমি এক সঙ্গেই পড়ি।' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন অনেকখানি সাহস ফিরে পেল। না, সে কোন অন্যায়ই করেনি, তার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই—কৃষ্ণার তাই মনে হলো—আর আশ্চর্য্য—ব্যাগ থেকে আয়নাটা বের ক'রে কৃষ্ণা একবার চুলগুলো ঠিক ক'রে নিলে। তার যেন কিছুই হয় নি, তার আচরণে এমনি একটা ভাব প্রকাশ পেল। এসব কৃষ্ণা অনেকটা অভিনয়ের মতই ক'রে গেল—কারণ সে বুঝ্‌তে পেরেছিল এই দাম্ভিক মহিলাটির কাছে লজ্জায় নুয়ে পড়্‌লে তিনি আরও চেপে বসতে চাইবেন। এ জাতের মহিলা সম্বন্ধে তার যথেষ্ট স্পষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল।

'তুমি বোধ হয় হস্টেলেই থাকো?'

'হ্যাঁ' কৃষ্ণা বেশ সহজ ভাবেই বল্‌লে।

'আর কখনও-কখনও এখানে-সেখানে।' মিসেস দে একটু কটাক্ষ ক'রে বল্‌লেন কথাটা।

এ-কথার অর্থ কৃষ্ণা জানে আর জানে বলেই নিজেকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করলো। তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে মিসেস দে আবার বল্‌লেন, 'আমি কালকের রাতের কথাই বল্‌ছি, কিছু মনে করোনা যেন।'

'আপনার কোন কথাই মনে করবার মত নয়। কালকের রাতের কথা আপনার ছেলেকেই জিগ্‌গেস করবেন। সে কাপুরুষ ব'লেই এখানে দাঁড়িয়ে আমাকে সে-কথার উত্তর দিতে হচ্ছে।' কৃষ্ণা যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

'সাহসী হ'লে আশা করি তোমাকে নিয়ে পালাবার সৎপরামর্শ দিতে।' মিসেস দে আক্রমন করলেন।

অস্বচ্ছভাবে হেসে কৃষ্ণা যথেষ্ট সহজ হ'তে চেষ্টা করে' বল্‌লে, 'আপনার ছেলের সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট গর্ব্ব আছে দেখ্‌ছি—না তা নয়—সাহস থাকলে আমাকে সে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতো।'

কৃষ্ণা আর কথা বল্‌তে পারছে না—তার চোখের জলও সব শুকিয়ে গেছে মনে হলো। 'আপনার আর কোন প্রশ্ন নেই আশা করি?' কৃষ্ণা দীপ্ত কণ্ঠে বল্‌লে।

'তুমি কী এখুনি চলে' যেতে চাও?'

'এখনও চলে' যায় নি কেন—আপনার সেই প্রশ্নই করা উচিত নয় কি?' কৃত্রিম একটু হেসে কৃষ্ণা চলে' যাবার জন্য অগ্রসর হলো।

'দাঁড়াও।' মিসেস দে'র গলায় আদেশের সুর। ড্রাইভারকে গাড়ী বের করতে বলে' তিনি আবার ফিরে এলেন।

'ড্রাইভার পৌঁছে দিলে তোমার আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই—'

'নিশ্চয়ই হবে।' কৃষ্ণা সগর্ব্বে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'বেশ, তবে জয়ন্তই পৌঁছে দেবে।' মিসেস দে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

'তাও নয়—আপনার গাড়ীতেই আমার যাওয়া চল্‌বে না মিসেস দে।'

'তুমি কি হেঁটে যেতে চাও নাকি?'

'কেন নয়? আর দরকার হ'লে বাস আছে।'

'রায় বাহাদুর পি সি দে'র বাড়ীর একটা এটিকেট আছে এবং তোমাকে তা মেনে চল্‌তে হবে।'

'এ আপনার অন্যায় জুলুম মিসেস দে—আমি আপনার বাড়ীর কেউ নেই—অথচ আমাকে আপনার নিয়ম মেনে চল্‌তে হবে? আমরা সাধারণ ঘরের মেয়ে, সাধারণ ভাবেই বেঁচে থাকতে চাই। আচ্ছা আসি তাহ'লে—নমস্কার মিসেস দে।'

'আর শোন।' মিসেস দে আবার পিছু ডাক্‌লেন। 'আর তোমাকে এ বাড়ীতে দেখ্‌তে পাবো না আশা করি।'

'না পাওয়ারই সম্ভব। কিন্তু জয়ন্তকে বিশ্বাস নেই—আবার কোন দিন ভাল মানুষের মত নেমন্তন্ন করে' এনে আপনার ওপর অভ্যর্থনার ভার দিয়ে সরে' পড়্‌বে।' কৃষ্ণা কৃত্রিম ভাবে খানিকটা হেসে সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে সুরু করলে। মিসেস দে একটু এগিয়ে এসে বল্‌লেন, 'পিছনের গেট দিয়ে যাও, ওদিকটায় কেউ থাকে না।'

প্রায় নীচের থেকেই উত্তর এলো, 'সাম্‌নে দিয়েই যাবো, পিছনটা আমি চিনি না।'

কৃষ্ণা গেট পার হ'য়ে অনেকটা চলে' এসেছে। শরীর দুর্ব্বল, শেষরাতে বোধ হয় একটু জরও হ'য়েছিল, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। কারও ওপর অভিযোগও নেই যেন তার। এই যেন তার প্রাপ্য ছিল, এছাড়া কীই বা এতদিন সে পেয়েছে!

স্যাণ্ডেলটা কোনরকমে পায়ে গলিয়েই জয়ন্ত রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লো। খানিকটা দ্রুত পা চালিয়ে এ-ফুটপাতে এসে কৃষ্ণাকে ধরে' ফেল্‌লে। জয়ন্তকে দেখেই কৃষ্ণা মুখ ফিরিয়ে নিল—কোনদিন যে তার সঙ্গে পরিচয় ছিল এরকম লক্ষণও তার ব্যবহারে প্রকাশ পেল না।

জয়ন্ত বল্‌লে, 'চা না খেয়েই চলে' যাচ্ছ?'

কৃষ্ণা কোন উত্তর করলে না।

'সঙ্গে আস্‌তে পারি?'

তারও কোন উত্তর নেই। কৃষ্ণা অন্যদিকে ফিরে আরও দ্রুত গতিতে চল্‌তে সুরু করলে। বড় রাস্তার ওপরেই বাসে উঠে কৃষ্ণা একবারও ফিরে তাকালে না।

মিসেস দে স্তব্ধভাবে বসে' রইলেন কিছুক্ষণ। একটু যেন খট্‌কা লাগ্‌লো তাঁর, ঠিক এতটা তিনি আশা করেন নি। চিরদিন সকলের উপর শাসন চালিয়ে এসেছেন—তাঁর মুখের উপর এত স্পষ্ট ধারালো প্রত্যুত্তর আর এতখানি অবজ্ঞা কোনও মেয়ের কাছ থেকে তিনি আশা করতে পারেন না। গত রাত্রির অনিদ্রা আর ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে; কিছু ক'রতে না পেরে মিসেস দে যেন আরও অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লেন। খানসামাকে ডেকে খানিকটা বক্‌লেন, অনাবশ্যক কতগুলো কাজের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। বেচারা মুখ নীচু ক'রে সেলাম জানিয়ে গেল।

মটর-সহিসের তখনও গাড়ী ধোয়া হয়নি—কোন কৈফিয়ৎ না নিয়েই তাকে ডিস্‌মিস্ করলেন। সরকারদের ঘরে অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল দু'জনেই অনুপস্থিত। মিসেস দে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন—একদিনের অমনোযোগিতায় সকলে প্রশ্রয় পেয়ে তাঁর নিয়ম আর শৃঙ্খলা ভেঙে দিতে চায়। আশ্রিতদের এতখানি সাহস তিনি সহ্য করতে পারেন না, তিনি শাস্তি দেবেন—আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে সকলকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন। মিসেস দে দ্রুত গতিতে উপরে উঠে এলেন—পায়ের আঙুলে আর শাড়িতে বাধা পেয়ে একটু আঘাত লাগ্‌লো—মিসেস দে'র কোন-কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই।—ড্রয়িং রুমেও মিঃ দে'র কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না—

শুধু পাইপটা টেবিলের উপর পড়ে' আছে দেখা গেল। বারান্দা পার হয়ে তিনি বেবির ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে' পড়্লেন।

বেবি মায়ের কাছে সরে' এসে বল্লে, 'মা, কাল রাতে আমি একটুও ঘুমুইনি, জানো।'

'তোমাকে ত আমি যেতে বারণ করেছিলাম' মিসেস্ দে গম্ভীর মুখে বল্লেন।

বেবি লজ্জিত ভাবে বল্লে, 'না সেজন্য নয়—রমলার মা কত যত্ন কর্লেন আমায় কিন্তু বাড়ীটায় এমন ইঁদুর, আমার ভয় করতে লাগ্লো।'

মিঃ দে'র ফুটবাথ নেওয়া তখন শেষ হ'য়ে গেছে—রুমালে মুখ মুছে একটা সিগারেট বের ক'রে বল্লেন, 'তারপর ?'

বেবি উচ্ছ্বসিত ভাবে বল্লে, 'আমার বেশ মজা লাগছিল ; বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ওদের ছুটোছুটি দেখ্ছিলাম, একটা দু'টো ত নয়—দস্তর মত একটা troop—ওরই মধ্যে আবার খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছিল—আমার pied piper of Hamelin কবিতাটা মনে পড়ে' গেল।'

মিসেস দে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'এ আর বিচিত্র কি—বাড়ীটা যা পুরোনো।'

'দেয়ালগুলোয় নোনা ধরেছে আর যা ছারপোকা—অশোক বাবু নাকি বলেছেন, ফিরে এসে ওটাকে ভেঙে-চুরে remodel করবেন।'

'সেই সুবিধেতেই রমলার মা আর নড়্ছে না, আর তা ছাড়া অন্য মতলবও কিছু থাক্তে পারে।'

একটু আগেই জয়ন্ত বাড়ী ফিরেছে। নানা কারণে মেজাজটা তার ভাল ছিল না—কৃষ্ণা যে কোন-কিছুতে অপমানিত হ'য়ে ফিরে গেছে এটা-সে মনে মনে আন্দাজ ক'রেছিল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাকে এতক্ষণ সে চেপে রেখেছিল—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুঠি ভরে' খানিকটা পাউডার ঢেলে নিয়ে হঠাৎ বলে' উঠ্লো, 'মা, তোমার মুখে এসব কথা ভাল শোনায় না।'

মিসেস দে টের পেলেন—জয়ন্তর স্বরে বিদ্রোহের সুর। ধমক দিতে গিয়ে তিনি নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন। মিঃ দে এসব বিশেষ লক্ষ্য করেছেন বলে' মনে হলো না। আগের কথার জের টেনেই বল্লেন, 'আচ্ছা ওরা যাঁগগাটা বিক্রী ক'রে দিলে ত পারে।'

'কে বিক্রী করবে ?' বেবি বললে।

'কেন, অশোক। অশোক মানেই ওরা' মিসেস্ দে উত্তর দিলেন।—'কেন কিন্‌বে নাকি তুমি ?' মিসেস দে একটু থেমে উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করলেন।

'নন্স কি'—সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকাতে পাকাতে মিঃ দে বল্লেন।

'পরের জিনিষের ওপর এরকম অন্যায় লোভ থাকা অসঙ্গত নয় কি ?' যথেষ্ট বিজ্ঞের মত গম্ভীর গলায় জয়ন্ত কথাটা বল্লে।

'তুই চুপ কর্—' মিঃ দে বিরক্ত ভাবে ধমক দিলেন, তারপর ভৎর্সনার স্বরে বল্লেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে—এবার তোমার পরীক্ষার বছর না ?'

মিসেস দে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে একবার জয়ন্তর দিকে তাকালেন—তারপর একটু হেসে বল্লেন, 'সে আর তুমি জান্‌তে চেওনা—ও সব পরীক্ষাতেই পাশ করবে।' (ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

ফ্রান্স

বর্তমান যুদ্ধের ইতিহাসে ফ্রান্সের ভাগ্য-বিপর্যয় এক করুনাতীত মর্মান্তিক অধ্যায়। প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার অবসান-কল্পে ফ্রান্স এত শীঘ্র যে যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবে হিটলারের দ্বারস্থ হবে—অন্তরঙ্গ মিত্র হ'য়েও গ্রেটবৃটেন শেষ মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত তা বুঝতে পারে নি। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য, পর্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব এবং মিত্রশক্তির সংখ্যাল্পতাই যে এই পরাজয়ের কারণ, ফ্রান্সের নবতম মন্ত্রীসভার নেতা মার্শাল পেত্যাঁ পরিষ্কার গলায় তা স্বীকার করেছেন।

ফ্রান্স জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। তবে, ইতালীর সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ-বিরতির এই চুক্তি বলবৎ হবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই জার্মানী একে-একে গোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, লুক্সেমবার্গ ও বেলজিয়াম অধিকার করে—শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নিল।

যুদ্ধের নতুনতম অঙ্কে এমন আমরা প্রধানত বৃটেন ও জার্মানীকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখতে পাবো। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল সম্প্রতি এই বলে' গর্ব অনুভব করেছেন যে, এতদিন জার্মানী একাকী বৃটেন ও ফ্রান্সের মতো দু'টি প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো—এখন বৃটেনকেই একা জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। হিটলারের দর্পচূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধের অবসান নেই এবং শেষ পর্যন্ত বৃটেনের জয়ই সুনিশ্চিত। সন্দেহ নেই, চার্চিলের এই গর্ববাক্তি বৃটেনের সমগ্র নরনারীর চিত্তে আশা ও উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে।

কিন্তু ফ্রান্সের এই পরাজয় থেকে বৃটেনেরও কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবার আছে। যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকদিন পূর্বে মার্শাল পেত্যাঁ বলেছেন, 'উনিশ শ' আঠারো সালে যুদ্ধ জয়ের পর থেকে ত্যাগের পরিবর্তে ভোগের বাসনাই জাতির মধ্যে প্রবল হয় এবং অতৃপ্ত আকাঙ্খা ও উদ্যমহীনতার ভাব উদ্যম হ'য়ে ওঠে। ফলে আজ জাতির এই দুর্দিন। শুধু ফ্রান্স নয়, গত বিশ বৎসরের সভ্যতার অনুগ্রহে য়ুরোপের বহুজাতির মেরুদণ্ডে এই বিষাক্ত ঘুন বাসা বেঁধেছে। গ্রেট বৃটেনের নৈতিক মেরুদণ্ড আজ নড়বড়ে না হ'লেও আদর্শস্থানীয় নয়। এবং এই যুদ্ধে জয়লাভও শেষ কথা নয়।

গত মহাযুদ্ধে জার্মানী শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিলো সত্য কিন্তু গত বিশ বৎসরের মধ্যে সে আবার তার শক্তিতে এক অবিশ্বাস্য জাদু অর্জন করেছে। শক্তির এই জাদুকে, নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে পশুবলের সঙ্গে তুলনা করা খুব কঠিন নয়, জানি। কিন্তু গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করতে বসে' নিজের অনুসৃত অনেক নীতির অবিলম্বে আমূল পরিবর্তন না করলে বৃটেনকে অদূর ভবিষ্যতে আক্ষশোষ করতে হবে।

ভারতে দেশরক্ষাবাহিনী ও ভারতরক্ষা আইন

কিছুদিন আগে ভারতের প্রধান সেনাপতি এক বিবৃতিতে ভারতে দেশরক্ষা বাহিনী গঠনের সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। বড়লাট বাহাদুর ও ভারত সচিবও বর্তমান যুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা আহ্বান করেছেন। ব্যাপারটি আমাদের কাছে কিন্তু রীতিমতো রহস্যজনক; এবং দুর্বোধ্যও বটে। কারণ, ভারতরক্ষা-আইনের আমলে ভারতে দেশরক্ষা-বাহিনীর পরিকল্পনায় কা'রা সহযোগিতা করবে? আহার-নিদ্রা, আমোদ-প্রমোদ ও নগণ্য জীবন-ধারণে সন্তুষ্ট না থেকে দেশের প্রকৃত শান্তি ও সুস্থ আবহাওয়ার জন্য যা'রা চিন্তা-চর্চা করে, ভারতরক্ষা-আইনের কল্যাণে তা'রা প্রায় সকলেই আজ কারারুদ্ধ।

আশ্চর্য্য, ভারতবর্ষ রক্ষার পরিকল্পনায় ভারতীয় কর্মীদের সহযোগিতা আহ্বান করা হয় আবার তাদেরই পশ্চাতে ভারতরক্ষা-আইন অনুসরণ করে। এই ভারতরক্ষা-আইনে এ পর্যন্ত দেশের রুই-কাত্‌লা থেকে চুনো-পুঁটি অবধি বহু ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের অপরাধ কি? এরা কি নাজীদলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত, না দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করছে? এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সর্বাগ্রে জনসাধারণকে আলোকিত করা উচিত।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যই যে ভারতরক্ষা-আইনের প্রয়োজন তা' সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু এই আইন যেভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে তা' উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল কিনা সন্দেহ। বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে সর্বাগ্রে কর্তৃপক্ষের এই সন্দেহের নিরসন করা কর্তব্য।

শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা নির্ণয়

আগামী আদমসুমারীতে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতের শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করবেন বলে' শোনা যাচ্ছে। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট এ-সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত তথ্য এ পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি। অশিক্ষিত বেকারদের বাদ দিয়ে গভর্ণমেণ্ট যখন শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা নির্ণয়ে উদ্যোগী হচ্ছেন, তখন স্বভাবতই আশা করা যায় যে তাদের বেকারত্ব ঘুচাবার কোনো ব্যবস্থা করাই উদ্দেশ্য। কার্যে পরিণত হ'লে, এ-রকম ব্যবস্থা যে খুবই বাঞ্ছনীয় তা' বলাই বাহুল্য।

য়ুরোপ ও আমেরিকার সকল দেশেই বেকার সংখ্যা গণনা করে' তার একটা হিসাব রাখার ব্যবস্থা আছে। ভারতে যে এতদিন এ-ব্যবস্থা ছিল না, এইটাই আশ্চর্য।

আগামী সংখ্যা থেকে 'পত্রিকা'য় মঞ্চ ও পর্দা সম্পর্কিত রচনাদি নিয়মিত প্রকাশিত হবে। এই বিভাগের পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী
১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ৭১।১ পটুয়াটোলা লেনের ইণ্ডর প্রেস হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়